প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ১ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ১১ জিলক্বদ, ১৪৪০ হিজরি | ১৫ ওফা, ১৩৯৮ হি. শা. | ১৫ জুলাই, ২০১৯ ঈসাব্দ

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

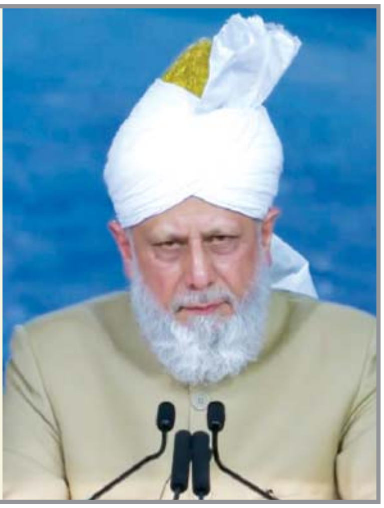

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

সত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকার নাম ইসলাম

পবিত্র কুরআন শরীফে 'ইস্তেকামাত'এর শিক্ষা রয়েছে। যেমন এই দোয়া শিখানো হয়েছে যে–

ইহ্‌দিনাস্ সিরাতা'ল মুস্তাকি্ম
সিরাতা'ল্লাযিনা আন্‌আ'মতা আলাইহিম

অর্থাৎ- আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাঁদের পথে যারা তোমার নিকট হতে পুরস্কার লাভ করেছে এবং যাঁদের জন্য স্বর্গীয় পথ খোলা হয়েছে।

এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার সরল-সুদৃঢ় পথের স্বরূপ নিরূপন করা হয়। অর্থাৎ- প্রতিটি জিনিষের শক্তি-সামর্থ এবং সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার স্বরূপ নিরূপিত হয়। মানব জীবনের লক্ষ্যও এটিই যে, তাকে খোদা-প্রেমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো, মানবকে খোদা তা'লার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব তার জন্য নির্ধারিত সরল-সুদৃঢ় পথ হলো, প্রকৃতভাবে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা। যখন সে তার যাবতীয় শক্তির মাধ্যমে খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করবে, অবশ্যই তখন তার জন্য পুরস্কার অবতীর্ণ হবে। অপর কথায় একে পবিত্র জীবন নামে অভিহিত করা যায়। যেমন, সূর্যের দিকে জানালা খুলে দেয়া হলে সুনিশ্চিতভাবে সূর্যের আভা ভেতরে এসে পড়ে।

এই পৃথিবীই পবিত্র জীবন লাভের স্থান। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

মান কানা ফি হাযিহী আ'মা
ফাহুওয়া ফিল আখেরাতে আ'মা
ওয়া আ'যাল্লু সাবীলা

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ থাকে এবং খোদাকে দেখার আলো পায়নি; সে পরকালেও অন্ধই থাকবে। (খ্রিষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর, পৃ. ১৮-১৯)

অতএব আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা সহজে অপসৃত হয় না বা বিনাচেষ্টায় দূরীভূত হয় না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, এর জন্য অবিরত চেষ্টার প্রয়োজন এবং দোয়া করা আবশ্যক। আর তখনই কেবল আল্লাহ্ তা'লার নিদশর্ন প্রকাশিত হয় এবং তিনি আচমকা মানুষকে স্বীয় নূরের চাদরে আবৃত করেন।

সকলের মঙ্গলাকাঙ্খী হওয়াই ইসলামের অনুপম শিক্ষা

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, 'মানুষের ইসমে আজম হচ্ছে– ইস্তেকামাত।' এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, 'ইসমে আজম এর অর্থ হলো, যদ্বারা মানব উৎকর্ষ লাভ করে'। যখন মানুষ মানবতায় উন্নতি লাভ করে তখন এর নাম ইস্তেকামাত (দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত) এবং ইসমে আজম। অর্থাৎ- মানুষ যেন মানবতায় উন্নতি করতে থাকে।

মানবতার ক্ষেত্রে যে অসীম পরাকাষ্ঠা রয়েছে তা প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক মু'মিনকে নিজ নিজ শক্তি সামর্থ অনুযায়ী অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। ইহ্‌দিনাস্ সিরাতা'ল মুস্তাকি্ম এর ব্যাপকতা এটিই; তাই এজন্য আমাদের দোয়া করা উচিত।

'দোয়া' সম্পর্কে এটা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতিহায় দোয়া করা শিখিয়েছেন। অর্থাৎ-

ইহ্‌দিনাস্ সিরাতা'ল মুস্তাকি্ম
সিরাতা'ল্লাযিনা আন্‌আ'মতা আলাইহিম

মনে রাখা উচিত এতে তিনটি বিষয় নিহিত। প্রথমতঃ, এ ক্ষেত্রে বিশ্ব-মানবতাকে অন্তর্ভুক্ত রাখা।' অর্থাৎ- ইহ্‌দিনাস্ সিরাতা'ল মুস্তাকি্ম এর দোয়াতে গোটা বিশ্ব এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে স্মরণ রাখা।

'দিতীয়তঃ, সকল মুসলমানকে নিজের দোয়ায় শামিল করা।' যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

'তৃতীয়তঃ, ঐসব ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভূক্ত করা, যারা বাজামা'ত নামাযে উপস্থিত। অতএব এমন নিয়্যতের ফলে সমগ্র মানবমণ্ডলী এতে অন্তর্ভূক্ত। আর খোদা তা'লার অভিপ্রায়ও এটিই। কেননা সূরা ফাতিহায় তিনি স্বীয় নাম 'রব্বুল আলামীন' রেখেছেন, যা সর্বজনীন সহানুভূতির শিক্ষা প্রদান করে যাতে জীবজন্তুও অন্তর্ভূক্ত।

এরপর নিজের নাম রেখেছেন 'রহমান', আর এ নাম মানবমণ্ডলীর প্রতি দয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। কেননা এ দয়া মানবমণ্ডলীর ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এরপর নিজের নাম রেখেছেন 'রহীম', আর এ নাম মু'মিনদেরকে দয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। কেননা 'রহীম' শব্দটি বিশেষভাবে মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য। আর স্বীয় নাম তিনি 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' রেখেছেন। এ নাম বাজামা'ত নামাযে অংশগ্রহণকারীদেরকে দয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। কেননা ইয়াওমিদ্দীন হচ্ছে সেই দিবসের নাম, যেথায় মানুষ খোদা তা'লার সম্মুখে দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে। ইহ্‌দিনাস্ সিরাতা'ল মুস্তাকি্ম এর দোয়াতে এসব বিস্তারিত বিবরণই রয়েছে।

এথেকে অনুধাবন করা যায় যে, এই দোয়াতে সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি সহানুভূতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আর সকলের মঙ্গলাকাঙ্খী হওয়াই ইসলামের অনুপম শিক্ষা।'

[খুতবাতে মসরূর ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ থেকে চয়নকৃত]

সূচিপত্র

১৫ জুলাই ২০১৯

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
প্রদত্ত ১৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৬

খিলাফত আধ্যাত্মিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে ১৬
মওলানা শামশাদ আহমদ কমর সাহেব

The Guardian
International Editition/Opinion/Sri Lanka
আমাকে খুন করার এ দৃশ্যপটটি স্বাধীনতার পরাজয় হিসেবে নয় বরং আশা করি একে প্রেরণা হিসেবেই দেখা হবে ২৩
লাছান্থা বিক্রমাতুঙ্গে

কলমের জিহাদ ২৭
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

জলসা সালানা যুক্তরাজ্য ২০১৯ ৩১
অনুষ্ঠানসূচী

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ৩৩
মৌলবী মোহাম্মদ

ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম? ইসলামে শান্তি লাভের পদ্ধতি ৩৫
খন্দকার আজমল হক

তালবীয়া– "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" ৩৯
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

সংবাদ ৪১

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন

www.ahmadiyyabangla.org

পাক্ষিক **'আহমদী'**র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল কাহফ-১৮

২৬। আর তারা তাদের প্রশস্ত গুহায় তিনশ' বছর অবস্থান করেছিল এবং তারা (এতে আরও) নয় (বছর) যোগ করেছিল[১৬৮৬]।

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ
وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝

২৭। তুমি বল, 'তারা কতকাল (সেখানে) অবস্থান করেছিল তা আল্লাহ্ সবচেয়ে ভালো জানেন[১৬৮৭]।' আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াবলী একমাত্র তাঁরই[১৬৮৭-ক] হাতে। তিনি কতই উত্তম দ্রষ্টা ও কতই উত্তম শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের কোন বন্ধু নাই। আর তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকেও অংশীদার হবার অনুমতি দেন না।

قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ
مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

২৮। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কিতাব থেকে তোমার কাছে যা ওহী করা হয় তা তুমি পড়ে শুনাও। তাঁর কথার পরিবর্তনকারী কেউ নাই। আর তুমি তাঁকে ছেড়ে কখনো কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَدًا ۝

২৯। আর তুমি নিজেকে তাদের সাথে যুক্ত রাখ, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি চেয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে। আর তোমার দৃষ্টি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় যেন তাদেরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে না যায়। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, আমরা যার অন্তরকে আমাদেরকে স্মরণ করা থেকে উদাসীন করে রেখেছি এবং যে হীন বাসনার অনুসরণ করেছে আর যার ব্যাপার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

১৬৮৬। যে সময়কালের মধ্যে প্রাথমিক যুগের খ্রিষ্টানরা যুলুমের শিকার হয়েছিল এবং গিরি-গুহাতে উদ্বাস্তুরূপে আশ্রয় নিতে এবং অন্যান্য স্থানে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল সেই সময়ের ব্যাপ্তি প্রায় ৩০৯ বছর ছিল এবং ঐতিহাসিক তথ্যও এই হিসাব সমর্থন করে। সাধারণ বিশ্বাসমতে খ্রিষ্টানদের নির্যাতন শুরু হয়েছিল ২৮ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার সময় থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে (এনসাইক ব্রিট)–প্রায় ৩০৯ বছরের ব্যবধানে। কিন্তু কনস্ট্যান্টাইন ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হন নি, বরং ৩০৯ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিলেন। সুতরাং ক্রুশের দুর্ঘটনাটি সাধারণ বিশ্বাস মতে ২৮ বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল (ক্রোনোলোজি, বাই আর্ক বিশপ উসার্স এন্ড ডেইলী বাইবেল ইলাসট্রেশন, বাই ডাঃ কিটো)।

১৬৮৭। প্রাথমিক যুগের খ্রিষ্টানরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অত্যাচারিত হয়েছিল, যথা রোম, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তারা গিরি গুহা এবং ক্যাটাকম্বগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ক্যাটাকম্বগুলোতে তাদের অবস্থান কোন মজার কাহিনী নয়। এরূপ আশ্রয়ের অবস্থান ও সময় সম্পর্কে সঠিক বিষয়াদি শুধু আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

১৬৮৭-ক। 'তিনি কতই উত্তম দ্রষ্টা ও কতই উত্তম শ্রোতা!' এই শব্দগুলোর মর্মার্থ কত তীক্ষ্ম তাঁর (আল্লাহর) দৃষ্টি এবং কত প্রখর তাঁর শ্রবণ শক্তি অথবা তিনি (আল্লাহ্ তা'লা) সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন।

হাদীস শরীফ

অহং ও হীনমন্যতা জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে

কুরআনঃ

"নিশ্চয় কোন জাতির অবস্থা আল্লাহ্ কখনোই পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা রা'দ : ১২)।

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা ক্বালা আন্না রসূলাল্লাহে (সা.) ক্বালা ইযা ক্বালার রসূলু হালাকান্নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)। অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূললুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল, বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (বা তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লামের উপর পেশ দ্বারা পড়লে তার অর্থ হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে।

উন্নতির জন্য মানুষের মধ্যে সব উপাদান রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার-অহমিকায় ভোগে, আবার কেউ ভোগে হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে, যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে বিদ্যমান থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ-সাহসের সঞ্চার করতে হবে, তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে চেষ্টা না করে যদি বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– তবে এটা অত্যন্ত হতাশার বহিঃপ্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে তারা নিরুৎসাহিত হবে আর হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় আসলেন। পলায়ন করা ইসলামে হারাম, আর 'আমরা পলায়ন করেছি'- এই ভেবে তারা লজ্জায়-শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতেন না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদেরকে মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? লজ্জায় তারা মাথা নীচু করে বল্লেন, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না উত্তম এ আচরণ, আর কত উত্তমই না এই শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর কথায় মন্তব্য করলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি আর কীভাবে আমরা নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআন এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সর্বদা সতেজ-মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি– 'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো'

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

কাফেররা দাবীর সাথে বলেছে যে, এখন এই ধর্ম শিগ্‌গীরই ধবংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের এই সাক্ষ্য কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। সেই সন্ধিক্ষণে তাদের শোনানো হয়েছিল– **ইউরিদুনা আই'ইউত্‌ফিউ' নূরাল্লাহি বি আফওয়াহিহিম্ ওয়া ইয়া' বাল্লাহু ইল্লা আই'ইউতিম্মা নূরাহু ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন** [সূরা আত্ তাওবা : ৩২] অর্থাৎ এ লোকেরা গর্ব ও অহঙ্কার ভরে নিজ মুখে বাগাড়ম্বরের সাথে প্রলাপ বকে যে–'এ ধর্ম কখনও সফল হবে না, এ ধর্ম আমাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে'। কিন্তু খোদা কক্ষনো এ ধর্ম বিনষ্ট হতে দেবেন না। যতক্ষণ না একে পূর্ণতা দান করছেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হবেন না।

অপর এক আয়াতে তিনি বলেছেন, **ওয়াআ'দাল্লাহুল্লাযিনা আমানু....** [সূরা তুন্ নূর : ৫৬] অর্থাৎ খোদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই ধর্মে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর খলীফাদের সৃষ্টি করবেন এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, অর্থাৎ-যেভাবে মূসা (আ.) এর সিলসিলায় দীর্ঘকাল ধরে খলীফা ও বাদশাহ্ প্রেরণ করেছেন, তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও করবেন, আর তা নির্বাপিত হতে দিবেন না [জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯০]

অতএব হে বন্ধুগণ! আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান যখন এটাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। সুতরাং এখন সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন-নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি, তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বেগাকুল না হয়। তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতও দেখা আবশ্যক, কেননা এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়।

কারণ এটা স্থায়ী, যার চলমান ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ আমি না যাচ্ছি, সেই দ্বিতীয়-কুদরত আসতে পারে না। আর আমি যখন চলে যাবো, তোমাদের জন্য খোদা তখন সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন, যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে, যেমনটা 'বারাহীনে আহমদীয়া'-য় খোদার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্পর্কে নয় বরং তোমাদের সম্পর্কে। যেমন খোদা তা'লা বলেছেন:

ম্যাঁয় ইস্ জামা'তকো জো তেরিঁ পেয়রু মেঁ কিয়ামত তক দুসরোঁ প্যর গালবাহ্ দুঙ্গা।

[অর্থাৎ 'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো'– অনুবাদক]

সুতরাং তোমাদের সাথে অবশ্যই আমার বিচ্ছেদের দিন আসবে, যেন এর পর সেই দিন আসে, যা 'চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস'।

[আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬]

জুমুআর খুতবা

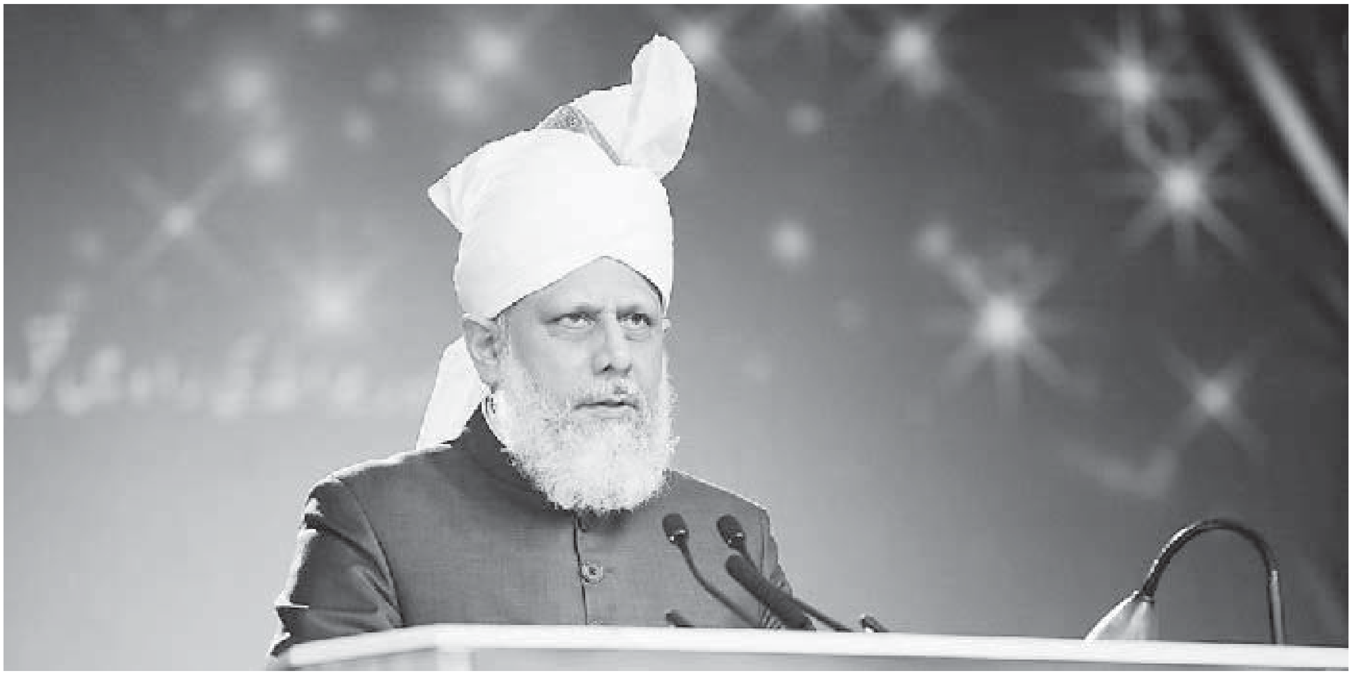

মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ
يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا ۞

(সূরা আল্ আহযাব: ৫৭)

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্তা এই নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তার জন্য রহমত যাচনা করে দরূদ পাঠ কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

জাগতিক কোন অপচেষ্টাই মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদার হানি ঘটাতে পারবে না

এই আয়াত এটি স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর উপর স্বীয় রহমতবারী বর্ষণ করছেন। তাঁর ফিরিশ্তারাও মহানবী (সা.)-এর জন্য দোয়া করছে এবং তাঁর জন্য রহমত কামনা করছে। যেখানে এই হল পরিস্থিতি, সেখানে বিভিন্ন অজুহাত ও অপকৌশলে মহান এই নবী (সা.)-এর (মর্যাদার) উন্নতিকে যারা বাধাগ্রস্ত বা মন্থর করতে চায়, তারা কখনো সফল হতে পারে না। তাঁর (সা.) উপর যারা অন্যায় অপবাদ আরোপ করে, তাঁকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে এই আত্মপ্রসাদ নেয় যে, **আমরা সফলতা লাভ করব, এরা আসলে আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছে।** তাদের এসব ষড়যন্ত্র এবং হীন চেষ্টা খোদার এই প্রিয় নবী (সা.)-এর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে পাঠিয়েছেন, তা তাঁরই বিশেষ কৃপায় অর্জিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ

প্রেমিককে পাঠিয়ে ইসলামের অনুপম ও আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রসারের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন।

অতএব, মহানবী (সা.), যাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল যুগের এবং পৃথিবীর সকল জাতির জন্য নবী মনোনীত করে পাঠিয়েছেন, তাকে সাহায্য করার নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপা এবং অনুগ্রহে উপকরণও নিজেই সৃষ্টি করে চলছেন। তাঁর (সা.) বিরোধীরা পূর্বেও কখনো সফল হয় নি আর এখনো হতে পারবে না। **এটি খোদার অটল সিদ্ধান্ত।** তাই প্রকৃত একজন মুসলমানের এ নিয়ে কোন চিন্তাই করা উচিৎ নয় যে, **জাগতিক কোন অপচেষ্টা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদার কোন হানি ঘটাতে পারে।** তবে একজন সত্যিকার মুসলমানের কাঁধে আল্লাহ্ তা'লা যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা হল, এই নবীর মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ যেভাবে তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করছেন, তেমনিভাবে তোমরাও স্বীয় দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ তা'লার এই প্রিয়, পূর্ণতম এবং শেষ নবীর প্রতি অজস্র ধারায় দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। এই হলো সত্যিকার এক মুসলমানের দায়িত্ব। নবী করীম (সা.)-এর কাজকে যারা এগিয়ে নিয়ে যায়, এমন বাহিনীতে যোগ দিয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তার আদর্শ অনুসরণে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদেরও অগণিত দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা উচিৎ।

দরূদ শরীফ পাঠের তাহরীক বা আহ্বান

সম্প্রতি ফ্রান্স যে ঘটনাপ্রবাহের সম্মুখীন হয়েছে আর মুসলমান হওয়ার দাবিদাররা আক্রমণ করে একটি পত্রিকা অফিসে যে ১২জনকে হত্যা করেছে, সে সম্পর্কে গত জুমুআয় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখের পর আমি আহমদীদের, তথা জামা'তের সদস্যদের দৃষ্টি দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি আকর্ষণ করে বলেছিলাম **হত্যা এবং রক্তপাতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় আসবে না বরং তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ পাঠের মাধ্যমেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে আমরা সফল হতে পারব।** একইসাথে এই উৎকণ্ঠাও আমি ব্যক্ত করেছিলাম যে, এই আক্রমণের ফলে ভ্রান্ত-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হতে পারে বা হবে আর এই লোকদের কাছে এমনটিই প্রত্যাশিত। অপরদিকে তারাও ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে আবারও কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে, যা আমাদের জন্য পুনরায় মর্মযাতনার কারণ হয়েছে। প্রত্যেক খাঁটি মুসলমানের জন্য অবধারিতভাবে সেটি কষ্টেরই কারণ। এই সন্ত্রাস করে কী লাভ হয়েছে? দু-তিন বছর পূর্বে এই পত্রিকার মালিকরা যে ন্যাক্কারজনক কাজ করেছিল, তা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবিদারদের ভ্রান্ত আচরণ চাপা পড়ে যাওয়া সেই ন্যক্কারজনক কর্মকে পুনরায় উস্‌কে দিয়েছে। এই পত্রিকা পূর্বে যা কিছু করে আসছিল, সে সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ কঠিন সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেক সরকার কঠোর ভাষায় বলেছে, আমরা আমাদের পত্রপত্রিকাকে কখনো এমনটি করার অনুমতি দেব না। কিন্তু গত সপ্তাহের ঘটনার পর বাহ্যত বিবেকবান এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই বাজে পত্রিকার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। আর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের কাছে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের সাহায্য আসতে আরম্ভ করেছে। এই পত্রিকা, যার প্রচার-সংখ্যা ছিল শুধু ৬০,০০০ কপি আর ধারণা করা হচ্ছিল যে, এটি মৃত্যুর প্রহর গুণছে এবং বন্ধ হতে চলেছিল, বরং বন্ধই হয়ে যেতো। মুসলমান নামধারীদের অপকর্ম এর প্রচার-সংখ্যা একদিন বা এক সপ্তাহের ভেতর পঞ্চাশ লক্ষাধিকে পৌঁছে দিয়েছে। কোন কোন সমীক্ষক বলছেন, এই যে পত্রিকা, যা হয়তো ছয় মাসও চলত না তা এখন আরো দশ-বারো বছর আয়ু লাভ করেছে।

অতএব, বিরূপ এই প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী শিক্ষার কেবল ভ্রান্ত চিত্রই তুলে ধরে নি, বরং মৃতপ্রায় শত্রুকে জীবিত করতেও ভূমিকা পালন করেছে। **হায়! এসব মুসলমান সংগঠন, যারা ইসলামের নামে যুলুম ও অন্যায় করে তারা যদি অনুধাবন করত** যে, ইসলামের প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার শিক্ষা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জগদ্বাসীকে ইসলামের আওতাধীন করার সামর্থ্য রাখে। ইসলাম যেভাবে ধৈর্য এবং সহনশীলতার শিক্ষা দেয়, এ ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে অন্য কোন ধর্মের তুলনাই হয় না। এরা তো সেই সকল জগৎপূজারী মানুষ যাদের ধর্মীয় দৃষ্টি অন্ধ, খোদার নবীগণ তো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাকেও যারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে না। এ সকল অজ্ঞদের অপকর্মের প্রত্যুত্তরে আমাদের পক্ষ থেকেও যদি অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণ প্রদর্শিত হয়, তাহলে হঠকারিতাবশত এরা আরও বেশি অজ্ঞতা প্রদর্শন করবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এদের হীনতার উত্তর দেয়ার পরিবর্তে এমন বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদেরকে উপেক্ষা কর।

কেননা, তাদের বৈঠকে বসা বা তাদের কথায় সায় দেয়া কেবল অপরাধই নয়, বরং মানুষকে তা পাপিষ্ঠ করে তোলে। এতটুকুই নয়, বরং এসব অপকৌশলকারীদের পাল্টা উত্তর যদি এভাবে দেয়া হয় আর প্রত্যুত্তরে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে তারা খোদা তা'লাকেই হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে বা বাজে কথা বলে অথবা মহানবী (সা.) সম্পর্কে অশোভন কোন উক্তি করে বা অন্য যে কোন অসম্মানজনক আচরণ যদি প্রদর্শন করে তাহলে আমাদের মাঝে যারা এমন (ইসলামের সঠিক শিক্ষার বিপরীত) আচরণ করবে, তারাও সেই পাপের সমঅংশীদার বলে গণ্য হবে।

অতএব, প্রকৃত একজন মুসলমানের এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত

এবং সিদ্ধান্ত খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন যে, তারা যেহেতু আমার কাছেই ফিরে আসবে, তাই তাদের অশোভন আচার ও আচরণের পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, সবাইকে একদিন আল্লাহ্ তা'লার কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবহিত করবেন যে, তারা কী করেছিল! আজকাল শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নেয়ার পরিবর্তে এমনই ঘৃণ্য এবং হীন কৌশল ব্যবহার করে ইসলামকে ও ইসলামী শিক্ষাকে এবং মহানবী (সা.)-কে অবমানিত করতে চায়। 'আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাগণও মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে থাকেন'– এই কথা বলে আল্লাহ্ তা'লা একটি নীতিগত কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এমন নীচ এবং হীন কর্মকাণ্ড মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের দায়িত্ব হল, এমন বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে এবং একই রকম অজ্ঞতাপ্রসূত উত্তর দেয়ার পরিবর্তে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করা। প্রকৃত একজন মুসলমানের কাজ এটিই। যথাযথভাবে এটি করে যাও। এই কাজ যদি তোমরা কর, তাহলে ধরে নিতে পার যে, তোমরা স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছ।

কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, এই অশ্লীল সাময়িকীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলত, এই আক্রমণের পর তাদেরই অনেকে এখন এই পত্রিকার পক্ষ নিয়েছে। বাকস্বাধীনতার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যায়পরায়ণ এবং বিবেকবান এমন মানুষও তাদের মাঝে আছেন, যারা মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই সাময়িকী বা পত্রিকার অপলাপকে অপছন্দ করেছেন এবং এই ঘটনার জন্য এর ব্যবস্থাপকদেরকে দায়ী করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, এক পত্রিকা বা সাময়িকীর নাম 'চার্লি হ্যাবদো' (Charlie Hebdo), এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন হেনরি রাসেল (Henri Roussel)। তিনি বলেন, এই পত্রিকা যে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করেছে তা ছিল উস্কানিমূলক আর কাণ্ডজ্ঞানহীন এই কাজ করে এর সম্পাদক তার টীমকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। এমন কর্মকাণ্ড আমাদের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী, যা গত কয়েক বছর ধরে এরা করে আসছে।

বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা চাই

অনুরূপভাবে, পোপও খুব সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, **বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা উচিত**। বাকস্বাধীনতার অর্থ পুরোপুরি লাগামহীন ছেড়ে দেয়া নয়। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক ধর্মেরই একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে আর সেই সম্মান অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক। কোন ধর্মেরই সম্মানে আঘাত হানা উচিৎ নয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি আরও বলেন, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও (যিনি তার সফর বা ট্যুরের সফরসূচী প্রস্তুত করেন) আমার মাকে যদি অভিশাপ দেয় বা তার সম্পর্কে কটুক্তি করে, তাহলে তার মুখে ঘুষি মারাই হবে আমার প্রতিক্রিয়া আর আমার কাছে এরূপ প্রতিক্রিয়াই তার আশা করা উচিত। যাহোক, কারও আবেগ ও অনুভূতিতে আঘাত করা অন্যায় অথচ এরা তাই করেছে। অতএব, দোষ তাদেরই। পোপ খুবই বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। এখন মুসলমানদেরও বিবেকবুদ্ধি খাটানো উচিত আর আবারো ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো হতে বিরত থাকা উচিত। আজকাল মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যম তো গোটা বিশ্ব ছেয়ে আছে। কোন স্থানে আগুন লাগানো বা নেভানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি বা দূর করার ক্ষেত্রে এই প্রচারমাধ্যমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এই ঘটনার পর যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া বা অবস্থান কী তা জানতে চেয়েছে আর আমাদের কাছে জানতে চাওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম। **প্রতিক্রিয়ায় আমরা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেছি, এটি অ-ইসলামিক কাজ।** এই প্রাণহানিতে আমরাও সমবেদনা প্রকাশ করছি। কিন্তু বাকস্বাধীনতারও একটা সীমা থাকা চাই নতুবা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তারাই দায়ী হবে যারা অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানে। যাহোক, এছাড়া আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনাও প্রেস বা মিডিয়াতে এসেছে। যুক্তরাজ্যে স্কাই নিউজ, নিউজ ফাইভ, বিবিসি রেডিও, এলবিসি, বিবিসি লিড্স, লন্ডন লাইভ ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, যেমন ফক্স টিভি, সিএনএন এবং কানাডার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। একইভাবে গ্রীস, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকারও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছে। তাদের স্টুডিওতে গিয়েও সাক্ষাৎকার দেয়া হয়েছে আর এভাবে বেশ কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে ইসলামের সত্যিকার অবস্থান ও শিক্ষা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এখানে একটি টেলিভিশন চ্যানেল আমীর সাহেবের সাক্ষাৎকারও নিয়েছে, এছাড়া মসজিদ ফযলের ইমাম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবেরও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। একইভাবে আমেরিকা, কানাডা ও ফ্রান্সে আমদের বিভিন্ন টীম আছে, সেসব টীমের প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছে। আমাদের প্রেস বিভাগেরও টীম রয়েছে। তাদেরকেও স্টুডিওতে ডেকে ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে বা প্রশ্ন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আমদের প্রবন্ধ এবং সন্দর্ভ প্রকাশ করেছে বা আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। যাহোক, এই টীমগুলো যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, কানাডাসহ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরার দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করে যাচ্ছে।

প্রেসের সাথে কানাডার টীমের যোগাযোগ এবং তাদের প্রকাশিত সংবাদ পাঠ করে প্রেসের একজন সাংবাদিক লিখেছেন, আমি জানতে চাই, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মুসলমানদের ছোট একটি ফির্কা

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচারমাধ্যমে তাদের পক্ষে এত বেশি কভারেজ পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ কী? আর সঠিক বাণী বা শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা তারা করছেই বা কেন? সত্যিকার অর্থে এটিতো ঐশী তকদীর, **এখন মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ও দাসের জামা'তই ইসলামী শিক্ষার সঠিক চিত্র জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরবে, যা তারা তাঁর (আ.) কাছ থেকে শিখেছে।**

অতএব, এখন এটি আমদের দায়িত্ব, যেমনটি আমি গত খুতবায়ও বলেছি, স্ব স্ব গণ্ডিতে পৃথিবীবাসীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছান এবং তাদেরকে বুঝান যে, ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। বর্তমানে পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা বিস্ফোরণোম্মুখ। এর ফলে এমন আগুন লেগে যাবে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে আর বর্তমান পৃথিবী এই অগ্নি নির্বাপিত করার শক্তি রাখে না। তাই, অন্যায় এবং ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মানুষকে উত্তেজিত করো না আর খোদার শাস্তিকেও আমন্ত্রণ জানিও না। পৃথিবীবাসীকে আল্লাহ্ তা'লা কাণ্ডজ্ঞান দিন।

কিন্তু এরই সাথে একজন আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব হল সেই নির্দেশ অনুসরণ করা, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রদান করেছেন অর্থাৎ–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! এক গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমরাও এই নবীর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর। যদিও এক মু'মিনকে খোদা তা'লার নির্দেশ মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, 'কেন বা কী জন্য করব'? এই প্রশ্ন উত্থাপন করা কাঙ্ক্ষিত নয়। সচরাচর এই প্রশ্ন মানুষ উঠায়ও না। ঈমান এবং ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান আর দোয়ার ব্যুৎপত্তি অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি নির্দেশের প্রজ্ঞা এবং উপকারিতাও মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় বা মানুষ বুঝতে পারে। জ্ঞান অর্জন করা আর শেখা ইসলামী শিক্ষার একটি সুন্দর দিক। ইসলাম এটিও বলে, জ্ঞান অর্জন কর এবং শিখো। এই বোধবুদ্ধি এবং ব্যুৎপত্তি লাভেরও চেষ্টা কর। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁর পানে অগ্রসর হতে থাক। যাহোক, এটি খোদা তা'লার নির্দেশ, তোমরা এসব শিখো যেন অচিরেই এর প্রজ্ঞাও তোমরা অনুধাবন করতে পার। এ অপেক্ষায় থেকো না যে, ধীরে ধীরে শিখে নেব। আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মেনে চলার প্রকৃত মর্ম ও ব্যুৎপত্তিও যেন অর্জিত হয়। এই জ্ঞান ও উপলদ্ধি অর্জিত হওয়ার সুবাদে উত্তমভাবে তা মেনে চলা যেন সম্ভব হয়।

দরূদ পাঠের গুরুত্ব

অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমি কতিপয় হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো, যা দরূদ শরীফের গুরুত্ব এবং এর উপকারিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করে। আমরা মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করি আর এ দাবির কারণেই আমাদের হৃদয় তখন ক্ষতবিক্ষত হয় যখন মহানবী (সা.) সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তি করা হয় বা যেকোন ধরণের ভ্রান্ত ও বাজে কথা তাঁর (সা.) প্রতি আরোপ করা হয়। কিন্তু এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ সত্যিকারে কীভাবে হবে বা এর কল্যাণ লাভ করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে, এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে মানুষের মাঝে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণকারী হবে। (সুনান তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবুল বিতর, বাবু মাজাআ' ফি ফাযলিস সালাত..., হাদীস নং-৪৮৪)

অতএব, মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, যার ফলে তাঁর নৈকট্য লাভ হয়ে থাকে তা হল দরূদ শরীফ পাঠ করা।

এরপর হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে সেদিনের ভয়ভীতি এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ব্যক্তি হবে সে, যে ইহকালে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ প্রেরণকারী হবে। তিনি (সা.) বলেন, আমার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাদের দরূদই যথেষ্ট ছিল, তবে এখানে মু'মিনদেরকেও পুণ্য অর্জনের এক সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা দরূদ প্রেরণ কর বা দরূদ পাঠ কর। (কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪, কিতাবুল আযকার, হাদীস নং-২২২৫, দারুল কিতাবুল আলামিয়া, বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.)

এরপর দোয়া করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কিত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ফাযালাহ বিন উবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূল করীম (সা.)-এর কাছে বসে ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে নামায পড়ে আর দোয়া করার সময় সে বলে, **"আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনী"**। হযরত নবী করীম (সা.) বলেন, হে নামাযী, তুমি তড়িঘড়ি নামায শেষ করেছ। যখন নামায পড় আর ক্বাদায় (নামাযের বসা অবস্থায়) বস তখন তোমার উচিত, প্রথমে খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করা এবং পরে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা, এরপর নিজের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে দোয়া করা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর অপর এক ব্যক্তি এলো, সে খোদার প্রশংসা করে এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে। রসূল করীম (সা.) তখন বলেন, **"আইয়্যুহাল মুসাল্লী উদ্‌উ তু'জাব"**। অর্থাৎ হে নামাযী! দোয়া কর, তোমার দোয়া গৃহীত হবে। (সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, বাবু মাজাআ ফি জামইস সালাওয়াতে আনিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং-৩৪৭৬)

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– তিনি মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে

শুনেছেন যে, তুমি যখন মুয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি শোন, তখন তুমি মনে মনে তা পুনরাবৃত্তি কর, যা সে বলে। এরপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুণ রহমত নাযিল করবেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে উসিলাহ্ যাচনা কর। কেননা এটি জান্নাতের পদমর্যদাগুলোর মাঝে একটি যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে দেয়া হবে আর আমি আশা করি, আমিই হব সেই ব্যক্তি। যে কেউ আমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে উসিলাহ যাচনা করবে, তার সপক্ষে শাফায়াত বা সুপারিশ করা আমার জন্য আবশ্যক বা হালাল হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাবুল কওলে মিসলু কওলিম মুয়াযযিন, লিমান সামিআ'হু, সুম্মা ইউসাল্লি আলান নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা, হাদীস নং- ৮৪৯)

অতএব, এই দরূদ শরীফ একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-এর জন্য হৃদয়ে প্রেমানুরাগ বৃদ্ধি করে, তেমনিভাবে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও তা আবশ্যক আর নিজের ক্ষমা লাভের জন্যও জরুরী। তাইতো হযরত উমর (রা.) বলেছেন, দোয়া ঊর্ধ্বলোক ও ভূলোকের মাঝে ঝুলন্তাবস্থায় থাকে আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্বীয় রসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দোয়ার কোন অংশ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত হয় না। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবুল বিতর, বাব মাজাআ, ফি ফাযলিস সালাত, আলান নাবী সাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং-৪৮৬)

এরপর দরূদ পাঠে কীরূপ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত, সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক শিষ্যকে লেখা পত্রে বলেন, "দরূদ শরীফ পাঠের প্রতি আপনি গভীর মনোযোগী থাকবেন। যেভাবে কেউ নিজের প্রিয়জনের জন্য সত্যিকার অর্থে কল্যাণ কামনা করে। অনুরূপ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে মহানবী (সা.)-এর জন্য কল্যাণ এবং আশিস যাচনা করুন এবং গভীর আকুতি ও মিনতির সাথে তা কামনা করুন। আর এই আকুতি ও মিনতি এবং দোয়ায় কৃত্রিমতার মিশ্রণ যেন বিন্দুমাত্রও না থাকে, বরং মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার বন্ধুত্ব এবং প্রেমানুরাগ থাকা চাই আর সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে সেই কল্যাণরাজী মহানবী (সা.)-এর জন্য যাচনা করা উচিত, যা দরূদ শরীফে উল্লিখিত আছে। ....আর ব্যক্তিগত ভালোবাসার অভিব্যক্তি হল, ভালোবাসতে গিয়ে কখনো ক্লান্ত ও শ্রান্ত না হওয়া এবং ব্যক্তিস্বার্থের কোন ভূমিকা না থাকা। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয়, কেবল এই উদ্দেশ্যেই দরূদ পাঠ করা উচিত।" (মকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৩৪-৫৩৫, মকতুব মীর আব্বাস আলী শাহ্, মাকতুব নং-১৮, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়া)

এরপর দরূদের হিকমত বা প্রজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, যদিও মহানবী (সা.)-এর জন্য অন্য কারো দোয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি (সা.) যেভাবে হাদীসে বলেছেন, আমার জন্য তো আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের দোয়াই যথেষ্ট। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তবে এতে একটি গভীর রহস্য অন্তর্নিহিত আছে। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভালোবাসার আবেগে কারও কল্যাণ এবং বরকতের জন্য দোয়া করে, সে একান্ত ভালোবাসার সম্পর্কের কল্যাণে নিজে সেই প্রেমাস্পদের (অর্থাৎ যাকে সে ভালোবাসে তার) সত্তার অংশ হয়ে যায়। (যে ব্যক্তি কারও জন্য রহমত এবং কল্যাণ যাচনা করে, সেই ব্যক্তির প্রতি তার এই ভালোবাসার কল্যাণে সে সেই ব্যক্তির সত্তার অংশ বা অঙ্গ হয়ে যায়)। তিনি (আ.) বলেন, "অতএব যার জন্য দোয়া করা হয়, তার উপর যে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয়, একই কল্যাণরাজী প্রার্থনাকারীর উপরও বর্ষিত হয়।" (যার জন্য দোয়া করা হয়, তার উপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে কল্যাণরাজী বর্ষিত হয়, সেই একই কল্যাণরাজী দোয়াকারীর উপরও বর্ষিত হয়।) "আর যেহেতু মহানবী (সা.)-এর উপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কল্যাণরাজী রয়েছে, তাই দরূদ পাঠকারী অর্থাৎ যে একান্ত ভালোবাসার প্রেরণা নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য আশিস কামনা করে, সেও নিজের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা অনুসারে সেই অশেষ বরকত থেকে অংশ পায় কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রেরণা এবং একান্ত এই ভালোবাসার কল্যাণরাজী খুব কমই প্রকাশ পায়।" (মকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫, মকতুব মীর আব্বাস আলী শাহ্, মাকতুব নং-১৮, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়া)

তাই আমাদের উচিত হবে, নিজেদের ভেতরে একান্তে এই আবেগ এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি করা।

এরপর দরূদ শরীফ পাঠের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "আমাদের নেতা ও আমাদের মনিব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখুন, তিনি সকল প্রকার নোংরা কর্মপরিকল্পনার মোকাবিলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তবুও কোনই ভ্রুক্ষেপ করেন নি। আর এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই খোদা তা'লা কৃপারাজী বর্ষণ করেছেন। তাইতো আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ এবং সালাম প্রেরণ কর।" (সূরা আল আহযাব: ৫৭)

তিনি (আ.) বলেন, "এই আয়াত থেকে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্ম বা আমল এমন পর্যায়ের ছিল যে, তার প্রশংসা বা বৈশিষ্ট্যকে সীমাবদ্ধ করার

জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি।" এগুলোকে (পুণ্যকর্ম ও কল্যাণরাজিসমূহ) সীমাবদ্ধ করার জন্যও বিশেষ কোন শব্দ নির্বাচন করেন নি। "শব্দ তো পাওয়াই যেতো, কিন্তু তিনি নিজেই তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তার পুণ্যকর্মের প্রশংসার কোন সীমা বা পরিসীমা ছিল না। (এটি এমন ছিল না যার কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা যায়) অন্য কোন নবীর মহিমা বর্ণনায় এমন কোন আয়াত ব্যবহার করা হয় নি। তিনি (সা.)-এর পবিত্র আত্মায় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মান এমনই উঁচু ছিল আর তাঁর কর্ম বা আমল খোদার দৃষ্টিতে এতই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই নির্দেশ জারী করে দিয়েছেন যে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মানুষ যেন ভবিষ্যতেও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করে। (তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩০, তোহফায়ে সালানা ইয়া রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭ইং, পৃ. ৫০-৫১, মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮)

দরূদ শরীফ দৃঢ়চিত্ততা লাভের এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যম, এ প্রাসঙ্গিকতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য (এবং সেই ভালোবাসায় নব গতি সঞ্চারের জন্য) সকল নামাযে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যিক, যেন সেই দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে অবিচলতা লাভ হয়।...দরূদ শরীফ, যা দৃঢ়চিত্ততা লাভের এক জোরালো মাধ্যম তা অজস্র ধারায় পাঠ কর। কেবল প্রথাগতরূপে বা অভ্যাসবশে নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য্য এবং তাঁর অনুগ্রহরাজীকে দৃষ্টিপটে রেখে তাঁর মর্যাদার উন্নতি এবং তাঁর সফলতার উদ্দেশ্যে পাঠ কর। এর ফলশ্রুতিতে দোয়া গৃহীত হওয়ার সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল তোমরাও লাভ করবে।" (রিভিউ অব রিলিজিয়নস, জানুয়ারি ১৯০৪, ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৪-১৫)

পদমর্যাদার উন্নতি কীভাবে হয়, পরবর্তীতে আমি তাও বর্ণনা করব। এরপর তিনি (আ.) বলেন, "এ যুগ কতই না কল্যাণময় যুগ। বিপদসঙ্কুল এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা নিছক নিজ অনুগ্রহে [হুযূর (আই.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এই কথা বলেছেন, সেই যুগেও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপলাপ করা হতো] মহানবী (সা.)-এর মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে এই কল্যাণময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অর্থাৎ অদৃশ্য হতে ইসলামের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন এবং এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে যারা এক প্রকার সহানুভূতি রাখে এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য যাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তারা বলুক এর চেয়ে ভয়াবহ কোন যুগ ইসলামের ইতিহাসে অতিবাহিত হয়েছে কী, যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এত গালি দেয়া হয়েছে, এত অপলাপ ও অসম্মান করা হয়েছে আর এভাবে কুরআন শরীফের অবমাননা হয়েছে? মুসলমানদের এহেন অবস্থা দেখে আমার গভীর আক্ষেপ হয় আর আমি মর্মযাতনায় ভুগি। অনেক সময় আমি এ কারণে ব্যাকুল হয়ে যাই যে, এই অসম্মান অনুভব করার মতো যথেষ্ট চেতনাও এদের ভেতর নেই।

আল্লাহ্ তা'লা কি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের আদৌ ভ্রুক্ষেপও করেন না যে, এত গালি এবং অপলাপ শুনেও কোন ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করবেন না?" [মুহাম্মদ (সা.)-এর এতটুকু সম্মান প্রদানই কি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রেত ছিল যে, এত গালমন্দ শুনেও তিনি একটি ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করবেন না? এখানে এ কথা বলেন নি যে, উঠো! হাতে বন্দুক তুলে নাও, লাঠি ধর আর হত্যা ও খুনোখুনি আরম্ভ কর। বরং বলা হয়েছে, এই সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এক ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল।] তিনি (আ.) বলেন, "ইসলামের বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে তাঁর মাহাত্ম্য এবং পবিত্রতা পৃথিবীতে বিস্তার করো।" (গোলাগুলির পরিবর্তে যুক্তি এবং ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মুখ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে।) এর কারণ হল, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ যেখানে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে থাকেন, সেখানে অসম্মান এবং অবমাননার এই সময়ে সেই সালাম এবং দরূদ প্রেরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা আল্লাহ্ তা'লা এখন এই জামা'তের মাধ্যমে (অর্থাৎ জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) প্রকাশ করেছেন। অতএব, পূর্বের তুলনায় আরও অধিক হারে দরূদ পাঠ করা আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "মহানবী (সা.)-এর হারানো আদর্শিক ঐতিহ্য পুনর্বহাল এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪)

অতএব, আজ সকল আহমদীর জন্য অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক যেন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নকারী হতে পারি, যেন আল্লাহ্ তা'লার ডাকে সাড়া দিতে পারি এবং যেন মহানবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের প্রেম ও ভালোবাসার দাবি সত্য প্রমাণিত হয়। অ-আহমদী মুসলমানদের মতো শুধু গলাবাজি বা মিছিল করে ভালোবাসার এই দাবি সত্য প্রমাণিত হবে না। এ ভালোবাসার দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল আহমদীর দায়িত্ব হবে বেদনাভরা হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে কোটি কোটি দরূদ ও সালাম আরশে পৌঁছে দেয়া। এই দরূদ শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বুলেটের চেয়েও অধিক কার্যকর এবং অব্যর্থ প্রমাণিত হবে।

দরূদ শরীফ পাঠ করার রীতি

এরপর দরূদ শরীফ পড়ার রীতি কী– এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) তাঁর এক মুরীদ বা ভক্তকে লিখেন, "এই বিষয়ের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখবেন, যেন প্রতিটি কাজ নিছক প্রথা এবং অভ্যাসের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে যায়। (কর্ম বা আমল যেন কেবল প্রথাগত বা অভ্যাসজনিত না হয়।) আন্তরিক ভালোবাসার প্রস্রবণ যেন প্রবল

বেগে উৎসারিত হয়।” (কুপ্রথা এবং অভ্যাসের মলিনতা থেকে এটিকে মুক্ত করুন। ভালোবাসা যেন অন্তর থেকে প্রবল বেগে প্রবহমান ঝর্ণাধারার মত প্রস্ফুটিত হয়।) তিনি (আ.) বলেন, “সাধারণ মানুষ যেভাবে তোতা পাখির মতো দরূদ শরীফ পড়ে থাকে সেভাবে পড়বেন না।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের পূর্ণ নিষ্ঠাও নেই আর পূর্ণ আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে তারা মহানবী (সা.)- এর জন্য ঐশী বরকত কামনায় দোয়াও করে না।” তিনি আরো বলেন, “দরূদ শরীফ পাঠের পূর্বে এই নিশ্চিত বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হওয়া উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আর মনে যেন কখনো এই ধারণাই না আসে যে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এমন কোন মানুষ অতিবাহিত হয়েছে, যাকে তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি ভালোবাসা যায় বা এমন কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে আসবে, যাকে তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি ভালোবাসা যাবে।” [অর্থাৎ অনেক অভিনিবেশ করার পরও অন্তরে যেন কখনো এই ধারণা সৃষ্টি হতে না পারে যে, মহানবী (সা.)-এর পূর্বে এমন কোন ব্যক্তি ছিল, যাকে এমনভাবে ভালোবাসা যায় বা ভবিষ্যতে এমন ব্যক্তির জন্ম হবে, যাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসা যেতে পারে।] আর এই পন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হওয়ার উপায় হল, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকরা তাঁর ভালোবাসায় যে দুঃখ এবং কষ্ট বরণ করেছেন বা ভবিষ্যতে বরণ করতে পারেন অথবা যেসব বিপদাবলী আসবার কথা ধারণা করা যায় সে সবকিছু সহ্য করার জন্য তাদেরকে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে প্রস্তুত থাকতে হবে। [অর্থাৎ পূর্বে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসায় মানুষকে যত দুঃখ ও যাতনা ভোগ করতে হয়েছে বা যত বিপদ ভবিষ্যতে নিপতিত হওয়ার আশংকা করা যায়, আন্তরিক নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর (সা.) সত্যিকার প্রেমিকরা সেসব বিপদাপদ শিরোধার্য করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকে।] আর এমন কোন সমস্যা বা বিপদের কথা যেন মাথায় না আসে, যা সহ্য করতে কুণ্ঠাবোধ হয় এবং এমন কোন নির্দেশের ধারণা যেন হৃদয়ে না আসে যার আনুগত্য করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব জাগে। আর এমন কোন সৃষ্টি যেন হৃদয়ে স্থান না পায় যা তাঁর (সা.) ভালোবাসায় অংশীদার হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, (এবং এমন উন্নত ঈমান যদি লাভ হয়) তখন দরূদ শরীফ, যেমনটি আমি মৌখিকভাবেও বুঝিয়েছি, এই উদ্দেশ্যে পড়া উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পূর্ণ বরকত এবং কল্যাণরাজি স্বীয় সম্মানিত রসূলের প্রতি নাযিল করেন এবং সারা বিশ্বের জন্য তাঁকে কল্যাণের প্রস্রবণের মর্যাদা দেন। তাঁর সম্মান ও মহিমা এবং মাহাত্ম্য যেন ইহকাল ও পরকালে প্রকাশ করেন, এই দোয়া করা উচিত।

(পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে এই দোয়া করা উচিত) যেভাবে কোন ব্যক্তি নিজের সমস্যার সময় পূর্ণ আত্মনিবেদনের চেতনা নিয়ে দোয়া করে তেমন বরং তার চেয়েও অধিক আকুতি মিনতির সাথে ও বিগলিত চিত্তে দোয়া করা উচিত। আর নিজের কোন স্বার্থ যেন এই দোয়ার মাঝে না থাকে যে, এই কাজ করলে আমার এই পুণ্য বা এই মর্যাদা লাভ হবে, (এই ধারণা নিয়ে দরূদ পড়বে না বা দোয়া করবে না যে, এতে আমার সম্মান লাভ হবে বা পুণ্যের ভাগী হব) বরং এই খাঁটি উদ্দেশ্যে পাঠ করা উচিৎ যে, প্রিয় রসূল (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ ঐশী বরকত বর্ষিত হোক আর তাঁর প্রতাপ ইহকাল এবং পরকালে প্রকাশ পাক এ উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত এবং স্থায়ী মনোযোগ সহকারে দিবানিশি দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিত।

অতএব, এভাবে যদি দরূদ পাঠ করা হয়ে থাকে তাহলে তা প্রথাগত ও অভ্যাসগত দরূদ হতে ভিন্ন দরূদ হবে। নিঃসন্দেহে এর ফলে বিস্ময়কর জ্যোতি প্রকাশ পাবে। পূর্ণ আত্মনিবেদনের একটি লক্ষণ হল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রন্দন ও আহাজারি অংশ হিসেবে এর সাথে থাকা চাই আর মন ও মস্তিষ্কের উপর এর প্রভাব এতটা বিরাজ করা উচিত যে, শয়ন ও জাগরণ উভয়ই সমান হয়ে যায়।” (মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২২-৫২৩, মীর আব্বাস আলী শাহ সাহেবের নামে পত্র, পত্র নং-১০, রাবওয়া, নাযারতে ইশায়াত)

এরপর দোয়া এবং দরূদে রত থাকার বিষয়ে এক মুরিদকে লেখা এক পত্রে তিনি (আ.) বলেন, “তাহাজ্জুদ নামায ও মসনুন (রসূলের অনুসৃত) দোয়া পাঠে রত থেকো। তাহাজ্জুদে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। কর্মহীন বসে থাকার কোন মানে হয় না। অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় মানুষের কোন গুরুত্বই নেই।” তিনি (আ.) আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(সূরা আনকাবুত: ৭০)

(অর্থাৎ- আমার পথে যারা জিহাদ বা চেষ্টাসাধনা করবে, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমাদের পথ প্রদর্শন করব।) তিনি (আ.) বলেন, “সেই দরূদ শরীফই সর্বোত্তম যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আর তা হল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

তিনি (আ.) আরো বলেন, “একজন সাবধানী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মুখ থেকে যে কথাই নিঃসৃত হয় তাতে অবশ্যই কিছু না কিছু কল্যাণ নিহিত থাকে।”

তাই ভাবা উচিত, পরহেযগারদের নেতা, যিনি নবীকুল শিরোমনি, নবীদের নেতা, তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যে শব্দ নিঃসৃত হয়েছে, (অর্থাৎ দরূদ শরীফের শব্দগুচ্ছের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে, যা এইমাত্র পড়া হয়েছে) তা কতই না কল্যাণময় হবে। এক কথায়, সকল প্রকার দরূদ শরীফের

মাঝে এই দরূদ শরীফই বেশি কল্যাণময় আর এই অধমেরও [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] দোয়া এবং ওযীফাও এটিই। এটি পাঠের জন্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়, বরং পূর্ণ নিষ্ঠা, ভালোবাসা, বিনয় এবং আকুতি ও মিনতি সহকারে তা পাঠ করা উচিত। মন গলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং আত্মবিস্মৃতির অবস্থা যতক্ষণ সৃষ্টি না হয় ও এক গভীর প্রভাব যতক্ষণ পরিলক্ষিত না হয় এবং হৃদয়ে পূর্ণ এক প্রশান্তি ও আনন্দদায়ক অনুভূতি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই পাঠ করা অব্যাহত রাখুন। (মকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৬, মীর আব্বাস আলী শাহ বরাবর পত্রাবলী, পত্র নম্বর-১৩, রাবওয়া, নাযারতে ইশায়াত)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার মাঝে এই প্রেরণা সঞ্চার করুন। আমাদের হৃদয় থেকে যেন এমন দরূদ উদ্ভূত হয় যা আরশে গৃহীত হবে এবং আমাদেরকেও আধ্যাত্মিকভাবে পরিতৃপ্ত করবে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে, যারা দরূদ নিয়মিত পড়েন এবং পরম ভালোবাসা নিয়ে দরূদ শরীফ পড়েন। এর ফলে লব্ধ কল্যাণরাজীর দৃশ্যও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ করুন, এমনভাবে দরূদ পাঠকারীর সংখ্যা জামা'তে যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উন্নতি লাভের পাশাপাশি জামা'তেরও উন্নতি হবে। **হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দরূদ পাঠের একটি রীতি আমার খুবই ভালো লাগে।** আমাদের অনেকের দরূদ পড়ার পদ্ধতি হয়তো এর কাছাকাছিই হবে। কিন্তু এটি এমন এক পদ্ধতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই, যার মাধ্যমে দরূদের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রতি নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয় আর জামা'তী উন্নতির জন্য কীভাবে দোয়া করতে হয় তাও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এক প্রসঙ্গে তিনি (রা.) বলেন, "আমরা যখন অন্যদের জন্য দোয়া করি, সেই দোয়া এক অর্থে আমাদের নিজেদের পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ারও কারণ হয়। আমরা যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি, এর ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-এর পদমর্যাদা উন্নীত হয়, তেমনি আমাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। তাঁর (সা.) পুরস্কার লাভের কল্যাণে তাঁর মাধ্যমে আমাদেরও তা লাভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চালনিতে যখন কোন কিছু চালা হয় তখন তা চালনির ফাঁক গলিয়ে তলায় যে পাত্র রাখা থাকে তাতে পড়ে।

অনুরূপভাবে, মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের জন্য চালনিস্বরূপ বানিয়েছেন। খোদা তা'লা প্রথমে তাঁকে স্বীয় কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেছেন, এরপর তাঁর (সা.) কল্যাণে সেই আশিস আমরাও লাভ করি। আমরা যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি আর আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা উন্নীত করেন, তখন আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এটিও অবহিত করেন যে, হৃদয়ের গভীর থেকে পড়া দরূদের এই উপহার অমুক মু'মিনের পক্ষ থেকে এসেছে। তখন মহানবী (সা.)-এর হৃদয়েও আমাদের জন্য দোয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয় আর আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়ার কল্যাণে আমাদেরকেও স্বীয় বরকত বা কল্যাণের ভাগী করেন।"

তিনি (রা.) আরো বলেন, "আমি নিজের সম্পর্কে বলছি, আমি যখনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমাধিতে দোয়া করতে যাই, আমার রীতি হল, আমি প্রথমে রসূল করীম (সা.)-এর জন্য দোয়া করি, এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য দোয়া করি আর যে দোয়া করি তা হল, হে আল্লাহ্! আমার সমীপে এমন কোন জিনিস নেই যা আমি আমার এই সম্মানিত পবিত্র বুযূর্গদের কাছে উপহার হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, আমার কাছে যা আছে তা তাদের কোন কাজে আসবে না, অবশ্য তোমার কাছে সবকিছুই আছে। তাই তোমার কাছে এই দোয়া এবং আকুতি ও মিনতি করছি যে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি তাদেরকে জান্নাতে আমার পক্ষ হতে এমন কোন উপহার দাও, যা ইতোপূর্বে তারা জান্নাতে লাভ করেন নি। এরূপ হলে তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, "হে আল্লাহ্! এই তোহ্ফা বা উপহার কার পক্ষ থেকে এসেছে" (আল্লাহ্ যখন উপহার দিবেন, তখন তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যে, এই উপহার কার পক্ষ থেকে।) আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদেরকে অবহিত করবেন যে, কার পক্ষ থেকে তা এসেছে তখন তারাও সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন আর দোয়াকারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাও এভাবে উন্নীত হয়ে থাকে– কুরআন ও হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্বীকৃত এবং গৃহীত। কোন ব্যক্তি এটি অস্বীকার করতে পারে না যে, দোয়া মৃত ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হয়ে থাকে। কুরআন শরীফেও–

فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

(সূরা আন নিসা: ৮৭) বলে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে উপহার দেয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তম উপহার তাকে দাও বা অন্ততপক্ষে যতটা সে দিয়েছে ততটা অবশ্যই দাও। কুরআনের এই আয়াত অনুসারে আমরা যখন মহানবী (সা.) বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য দোয়া করব, তাদের প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ করব, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পক্ষ থেকে এই দোয়ার কল্যাণে তাদেরকে কোন উপহার দিবেন।

আমরা জানি না যে, জান্নাতে কী কী নিয়ামত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তো সেসব নিয়ামত সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তাই আমরা যখন দোয়া করব যে, হে আল্লাহ্! তুমি মহানবী (সা.)-কে এমন কোন উপহার দাও, যা ইতোপূর্বে তিনি লাভ করেন নি। এটি জানা কথা যে, যখন তাকে সেই উপহার দেয়া হবে এবং একই সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটিও বলা হবে যে, এই উপহার অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এসেছে, একথা জানার পর

এটি কীভাবে হতে পারে যে, তিনি চুপ করে বসে থাকবেন আর উপহার প্রেরণকারীর জন্য দোয়া করবেন না।

এমন ক্ষেত্রে স্বভাবতই তাদের আত্মা খোদার চরণে সেজদাবনত হবে এবং বলবে, হে আল্লাহ্! এখন তুমি আমাদের পক্ষ থেকেও একে উত্তম প্রতিদান দাও। এভাবে–

فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

অনুসারে সেই দোয়া দরূদ প্রেরণকারীর পক্ষে গৃহীত হবে এবং তার পদমর্যাদার উন্নতির কারণ হবে। অতএব, এ হল সেই মাধ্যম যার কল্যাণে কোন প্রকার পৌত্তলিকতায় লিপ্ত না হয়েই আমরা নিজেরা লাভবান হতে পারি আর জাতিও লাভবান হতে পারে। এক কথায়, দরূদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় প্রকার কল্যাণই সাধিত হতে পারে।” [মাজারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পার দোয়া আওর উসকি হিকমত, আনোয়ারুল উলুম ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯২]

অতএব, এটি এমন এক রীতি, যে সম্পর্কে আমি পূর্বে বলেছি, এর ফলে জামা'তের উন্নতির পথও সুগম হবে। জামা'ত যদি উন্নতি করে আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠকারীর সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তাহলে বিরোধীদের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকবে।

এছাড়া আরো একটি কথা আমি বলতে চাই, অনেকে প্রশ্ন করে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

এবং

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ

এই শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন কেন? এই বিষয়ে অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে ‘আস্-সালাত’-এর আরেকটি অর্থ ‘আত্-তাযীম’। অতএব, এই নিরিখে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

দোয়ার অর্থ হবে, হে আল্লাহ্! তুমি এই পৃথিবীতে মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর নাম সমুন্নত করে তাঁর পয়গাম বা বাণীকে সাফল্য ও বিজয় দানের মাধ্যমে এবং তাঁর শরীয়তকে স্থায়ীত্ব দানের মাধ্যমে মাহাত্ম্য প্রদান কর আর পরকালে তার উম্মতের পক্ষে শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তার প্রতিদান বেশ কয়েক গুণ বর্ধিতরূপে ফেরত দেয়ার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিগুলোতেও কতিপয় বাক্যে এর বিস্তারিত বিবরণ চলে এসেছে, তবে আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

এরপর মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে হাদীসে–

بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীরুল কুরআন, বাব কওলুহু আন তুবদু শাইয়্যান আও তুখফুহু...হাদীস নং-৪৭৯৭)

এই দোয়ার অর্থ হল, হে আল্লাহ্! যে সম্মান ও মাহাত্ম্য এবং সুমহান মর্যাদা ও বুযুর্গী তুমি মহানবী (সা.)-এর জন্য অবধারিত করেছ, তা তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং সেটিকে স্থায়ীত্ব প্রদান কর।

অতএব, সার কথা হল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

এ তাঁর (সা.) শরীয়তের বিজয় আর স্থায়ীত্ব এবং উম্মতের পক্ষে তার শাফায়াত বা সুপারিশ থেকে কল্যাণ লাভের দোয়া অন্তর্নিহিত আছে আর এতে তাঁর (সা.) সম্মান, মাহাত্ম্য এবং মহিমা স্থায়ী হওয়ার দোয়া রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে দরূদ পাঠ করার তৌফিক দান করুন আর এই দরূদের কল্যাণে খোদার নৈকট্য লাভের পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় যেন আমাদের স্থায়ীভাবে উন্নতি হতে থাকে এবং তার শরীয়তের প্রসার ও বিস্তারের কাজে আমরা যেন নিজেদের সকল শক্তি নিয়োজিত করতে পারি আর তাঁর (সা.) শিক্ষা অনুসারে পৃথিবী থেকে ফিতনা এবং নৈরাজ্যের অবসানের ক্ষেত্রে আমরা যেন নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন।

এখন দু'ব্যক্তির গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা দিল্লী নিবাসী মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেবের, তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। ৯৭ বছর বয়সে গত ১০ জানুয়ারি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ডাক্তার আব্দুর রহীম সাহেবের পুত্র। মাদ্রাসা আহমদীয়া থেকে তিনি মৌলভী ফাযেল পাস করেন এবং কাদিয়ানে নিম্নলিখিত পদে খেদমতের সুযোগ পেয়েছেন– দরবেশী যুগের সূচনাকালে কাদিয়ানের আহমদীয়া মহল্লায় জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। দীর্ঘকাল নায়েব নাযের দাওয়াত ও তবলীগ ছিলেন এবং নাযেরে আলার সহকারীও ছিলেন। এছাড়া নাযেম জায়েদাদ, কাজী, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারী বেহেশতী মাকবেরা এবং নায়েব সদর আনসারুল্লাহ্ ছিলেন।

মরহুম মৌলভী সাহেবের একটি প্রবন্ধ “দাস্তানে দরবেশ বাযুবানে দরবেশ” (দরবেশের নিজ ভাষ্যে দরবেশের জীবনকাহিনি) শিরোনামে মিশকাত পত্রিকায় ২০০৩ সনের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি লিখেছেন, হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব আমাকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় আমাদেরকে সিনিয়র ক্লাসে হাদীস শরীফ পড়াতেন। তিনি আমাকে বলেন, শিক্ষার্জনে মিশরে যাওয়ার জন্য আবেদন কর। তার কথামত আবেদনপত্র আমি অফিসে জমা দিলাম। ব্যবস্থাপকদের পক্ষ হতে উত্তর আসে যে, পাসপোর্ট বানানোর পয়সা যার কাছে নেই, মিশর গিয়ে সে করবে কী? হযরত মীর সাহেবকে উত্তরের কথা আমি জানিয়ে দেই। তিনি (মীর আব্দুল কাদের সাহেব) বলেন, দু'দিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) এসেছেন এবং বলছেন, “আব্দুল কাদের!

মিশর।" এই স্বপ্নও আমি হযরত মীর সাহেবকে শুনাই। দৈবক্রমে যা ঘটেছে তাহলো, তখন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগ।

জামা'তে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে যুবকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছিল। আমিও জামা'তের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীতে চলে যাই আর সাপ্লাই বিভাগে যোগ দেই। বিশ্রামের জন্য সৈন্যদেরকে এক সপ্তাহ বা দশ দিনের ছুটি দেয়া হতো। আর এভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সুবাদে তিনি মিশরেও পৌঁছে যান। তিনি বলেন, এই অধম ছুটি কাটাতে ভারতে আসার পরিবর্তে রোমে যাওয়া পছন্দ করি। সেখানে গীর্জার পাশে ডান দিকেই একটি প্রশস্ত হলরুম ছিল। জিজ্ঞেস করার পর লোকেরা আমাকে জানায় যে, সপ্তাহে একদিন, প্রতি সোমবার পোপ সাহেব এখানে বক্তৃতা করেন আর ভক্তরা তার দর্শনে আসে। (পোপ সেই সময় সেখানে রোমে আসতেন।) তিনি বলেন, সেদিনও সোমবার ছিল। তাই আমিও সেই হলে চলে যাই। হলের ভেতরে মানুষ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছিল। যুগ যেহেতু ছিল যুদ্ধের, তাই পোপ সাহেব বিশ্বশান্তি সম্পর্কেই বক্তৃতা দেন। এরপর শ্রোতাদের পাশ ঘেঁষে পোপ ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পাশ ঘেষে যাওয়ার সময় আমি করমর্দনের জন্য তার দিকে আমার উভয় হাত প্রসারিত করি। পোপ সাহেবও তার হাত আমার হাতে রাখেন। আমি তার হাত ধরা অবস্থায় তাকে ইসলামের বাণী পৌঁছাই। হযরত মসীহ্‌র দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তাকে অবহিত করি যে, তিনি এসে গেছেন আর কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) মসীহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, আমি তাঁকে গ্রহণ করেছি, আর আপনাকেও তাঁকে গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। (এভাবে তিনি পোপকে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছিয়েছেন।) পোপ আমার কথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেন। পরে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আগত সকল দর্শক আমার চতুস্পার্শ্বে সমবেত হয় এবং আমার সাহসিকতার প্রশংসা করে। আমি তাদেরকেও তবলীগ করি। পোপ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ আমি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে লিখে পাঠিয়ে দেই। 'তারীখে আহমদীয়াত'এর দশম খণ্ডে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে "পোপকে ইসলামের তবলীগ" শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে। (তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯-৫৫০, টিকা)

এই প্রবন্ধে তিনি তার দোয়া গৃহীত হওয়া এবং ঐশী কুদরতের তিনটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। ১৯৫৯ সনে তিনি হজ্জব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমের তিন ছেলে এবং চার কন্যাসন্তান রয়েছে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তাদের সবাইকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। সন্তানদের সকলেই বহির্বিশ্বে অবস্থান করছেন। বড় ছেলে ইসমাইল মুনীর সাহেব জার্মানিতে জামা'তের বিভিন্ন পদে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। দরবেশী যুগে এই ছেলের জন্ম হয়। তিনি তার প্রথম সন্তান। তিনি লিখেছেন, মরহুমের স্ত্রী বেশ কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। কাদিয়ানে তিনি একাই জীবনযাপন করতেন। এজন্য মেয়েরা তাকে জার্মানি আসার অনুরাধ করে। উত্তরে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এমন কথা আর কখনো আমার সাথে বলবে না। বছরের পর বছর কাদিয়ানে তিনি একা জীবন কাটিয়েছেন। আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দরবেশ হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি মূসী ছিলেন। কাদিয়ানে দরবেশদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় তিনি সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল শ্রদ্ধেয়া মুবারেকা বেগম সাহেবার, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ বশীর আহমদ সাহেব হাফেযাবাদী মরহুমের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৫ সনের ৩ জানুয়ারি ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পিতা জনাব শফী আহমদ মরহুম উত্তর প্রদেশের মুধা জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ ছিল যে, ১৯৪৭ সালের পর দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তানে দরবেশদের বিয়ে করানো কঠিন হচ্ছে, তাই দরবেশরা যেন ভারতেই বিয়ে করে। এই আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে বশীর আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব উত্তর প্রদেশ থেকে ১৯৫১ সনে বিয়ের প্রস্তাব পান। মরহুমা মোবারেকা বেগম নামায এবং রোযায় অভ্যস্ত, নেক এবং নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। জামা'তী তাহরীকে চাঁদা হিসেবে নিজের গহনাগাটি দিয়ে দেন। স্বামীর দীর্ঘ দরবেশীর কঠিন যুগ ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেন। সকল পরিস্থিতিতে স্বামীকে সঙ্গ দিয়েছেন। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অবস্থা অনেক সচ্ছল।

প্রথম দিকে দরবেশরা খুবই অসচ্ছল অবস্থার মাঝে দিনাতিপাত করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর সম্পৃক্ততা ছিল। মরহুমার এক ছেলে জনাব মুনীর আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব কাদিয়ানে তাহরীকে জাদীদের উকীলে আলা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ফযলে ওমর প্রেসের ব্যবস্থাপনা পরিষদেরও সভাপতি। একইসাথে তিনি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী। দ্বিতীয় ছেলে মেডিকেল প্র্যাক্টিস করছেন। তিন কন্যা পাকিস্তানে রয়েছেন। মৃত্যুর সময় দু'মেয়ে তার কাছেই ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আমার দোয়া থাকবে তার সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আহমদীয়াত অব্যাহত থাকার পাশাপাশি তারা যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়াতের কাজে অংশ নেয় এবং ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি করে।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা ৬, পৃ. ৫-৯)

খিলাফত আধ্যাত্মিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে

মওলানা শামশাদ আহমদ কমর সাহেব
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদীয়া জার্মানি

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ
يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(সূরা আন্ নূর: ৫৬)

বিশ্বের চলমান অবস্থার প্রতি অভিনিবেশকারী নিরপেক্ষ মনমানসিকতার অধিকারী প্রত্যেক মানুষ আজ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, বিশ্ব ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, মিথ্যা, অবিশ্বস্ততা, প্রতারণা আর অন্যায়-অবিচারের কারণে বিশ্বে অস্থিরতা আর পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষের অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। এত্থেকে মুক্তি লাভের উপায় কী তা কেউই বুঝতে পারছে না। ক্ষমতার নেশায় বুঁদ বিভিন্ন জাতি সভ্যতা-ভব্যতা জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্বল জাতিগুলোকে অপদস্থ করে যাচ্ছে। নিজেদের উদর পূর্তি করার লক্ষ্যে নিরপরাধ লোকদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। একদিকে শক্তিধর জাতিগুলো পৃথিবী থেকে খোদার নাম আর আকাশ থেকে তাঁর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে আর অপরদিকে বাহ্যত খোদার প্রতি বিশ্বাসীরাও খোদাকে পরিত্যাগ করে সেসব শক্তির সামনে মাথানত করতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল! এসব কি এভাবেই চলতে থাকবে? সত্যিকার অর্থেই কি খোদার নাম মুছে ফেলা হবে? তাঁর রসূলের শিক্ষা কি বিস্মৃত হয়ে যাবে? কখনোই না। সেই খোদা, যিনি সকল শক্তি ও মহিমার আধার আর সবচেয়ে মহান অধিপতি, তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি কখনোই এমনটি হতে দিবেন না। যেভাবে তিনি প্রাথমিক যুগে আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি রেখেছেন এবং তাঁর তিরোধানের পর নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রবর্তিত খিলাফতের মাধ্যমে এই ধর্মকে সুদৃঢ় করেছেন, একইভাবে তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আখারীন বা পরবর্তীদের মধ্যেও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের মাধ্যমে একই ধর্মের পুনর্জাগরণের ভিত্তি রচনা করেন, আর এরপর নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রবর্তিত খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমাদের বিশ্বাস হল, এখন এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হবে। আর সত্য স্বীয় সকল কল্যাণসহ আসবে আর মিথ্যা তার সকল অকল্যাণসহ পলায়ন করবে। যারা এই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে খোদা তাদেরকে আহসানে তাকভীম বা সবচেয়ে উন্নত স্তরে নিয়ে যাবেন আর তাদের জন্য অসীম পুরস্কার থাকবে আর যারা এত্থেকে পৃথক হবে তারা আসফালা সাফেলীন বা সবচেয়ে নিকৃষ্টদের দলে গিয়ে ভিড়বে। আর তাদের জন্য ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল পথ রুদ্ধ হতে থাকবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

অনুবাদ: **তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার করেছেন, নিশ্চিয় তিনি পৃথিবীতে তাদেরকে খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে খলীফা বানিয়েছেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী।** (সূরা আল্ নূর: ৫৬)

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের মধ্যে ততদিন পর্যন্ত নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। ... যখন এই যুগ শেষ হয়ে যাবে তখন এর চেয়েও ভয়ানক অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে...। এরপর পুনরায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।"** (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩, মিশকাত: বাবুল ইনযারে ওয়াত তাহযীর)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও**

আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা তা স্থায়ী যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমার চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত'-কে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে।" (রূহানী খাযায়েন ২০শ তম খন্ড, পৃ: ৩০৫)

সম্মানিত সুধী! যখন পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোকদের সাথে খোদা তা'লা স্বয়ং খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর হাদীসে খোদার রসূল (সা.) শেষ যুগে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ দিয়েছেন আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খিলাফতের শুভসংবাদ শোনাচ্ছেন কাজেই এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে,সত্যিকার অর্থে এ যুগে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন শুধুমাত্র খিলাফতের সাথেই সম্পৃক্ত। কেননা, খিলাফত একটি উন্নত মানের পুরস্কার, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের প্রদান করছেন, যদি তোমরা ঈমান আনো আর সৎকাজ কর তাহলে তোমাদেরকে খিলাফতরূপী এমন ব্যবস্থাপনা প্রদান করবো যার ফলে তোমাদের ধর্ম সুদৃঢ় হবে। তোমাদের ভয়-ভীতি, শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে যাবে। তোমাদের মাঝে ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে আর তোমরা শিরকের নোংরামী বা অপবিত্রতা হতে নিরাপদ থাকবে। অর্থাৎ ইবাদত না থাকা বা লোক দেখানো ইবাদত করা, শিরকের পূজা করা– এগুলো সবই আধ্যাত্মিক জীবনের শত্রু। কিন্তু খিলাফতের কল্যাণে সত্যিকার ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে আর শিরক নির্মূল হবে। এভাবে খোদা তা'লা খিলাফতের কল্যাণে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন।

এরপর বলেছেন–

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থাৎ, কেউ যদি এই আশিসপূর্ণ ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করে সে দুষ্কৃতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফাসেক এর অর্থ হল খোদার নির্দেশ অমান্য করা বা অস্বীকার করা। যেমনটি ইবলিস সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

(সূরা আল্ কাহাফ : ৫১) অর্থাৎ, সে স্বীয় প্রভুর নির্দেশের অবাধ্য হয়ে গেল।

কাজেই খিলাফতকে অস্বীকার করা মূলত খোদাকে অস্বীকার করার নামান্তর। তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর অস্বীকার করার নামান্তর। খিলাফতের অস্বীকারকারী মূলত ধর্মের দৃঢ়তার অস্বীকারকারী। মু'মিন বা বিশ্বাসীদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তনের অস্বীকারকারী। খোদার ইবাদত প্রতিষ্ঠার অস্বীকারকারী। সে মূলত পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার ঘটাতে চায়। কিছুটা চিন্তা করে দেখুন! এমন লোকদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে কিসের সম্পর্ক। তারা শুধু দেহ সর্বস্ব, যা থেকে অনর্থক আওয়াজ বা শব্দ নির্গত হয়। তাদের কথাবার্তা নিরর্থক। তাদের কাজকর্ম বেহুদা। তাদের ধন-সম্পদ, তাদের মিথ্যা সম্মান, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই নিষ্ফল। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

(সূরা আল্ আ'রাফ: ১৮০) অর্থাৎ, তাদের অন্তকরণ আছে ঠিকই কিন্তু তারা চিন্তা-ভাবনা করতে অক্ষম। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু দেখতে অক্ষম, তাদের কান রয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা শোনে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

(সূরা আন নিসা: ৮১) অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে আর মহানবী (সা.) বলেছেন, যে আমার আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে আর যে আমার আমীরের অবাধ্য হয় সে আমার অবাধ্যতা করে। (মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ্)

আরেকটি হাদীসে বলেছেন, কেউ যদি বয়আত না করে মারা যায় তাহলে **"ফাকাদ মাতা মিতাতাল জাহিলিয়্যাত"** সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ্) আরো বলেছেন, **"ইয়াদুল্লাহি আলাল জামায়াতে ওয়া মান শায্যা শুয্যা ইলান্ নার"** (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন) অর্থাৎ, আল্লাহ্র সাহায্য জামাতের সাথে থাকে। যে ব্যক্তি জামাত থেকে পৃথক হয়ে যায় সে মূলত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সম্মানিত সুধী! জামাত বা দল তো অনেক হয়ে থাকে। তাহলে এখানে **'আল্জামাআত'** বলতে কোন জামাতকে বুঝানো হয়েছে। একটি হাদীসে মহানবী (সা.) স্বয়ং এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি (সা.) শেষ যুগের নৈরাজ্যের উল্লেখ করার পর বলেছেন, **"ফাইন রাআইতা ইয়াওমাইযিন খালিফাতাল্লাহে ফিল আরযে ফালযিম ওয়া ইন নুহিকা জিসমুকা ওয়া উখিযা মালুকা"** (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থাৎ, তোমরা যদি তখন পৃথিবীতে খোদার খলীফাকে দেখ তাহলে তাঁর সঙ্গে চিমটে থেকো, এতে যদি তোমাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবুও। এই হাদীস প্রমাণ করে, এখানে জামাত বলতে এমন একটি জামাতকে বুঝানো হয়েছে যাদের একজন অবশ্য অনুসরণীয় খলীফা থাকবে।

কাজেই আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক,যা আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি, মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা এবং আনুগত্যের কল্যাণেই লাভ করা সম্ভব। আর বর্তমানে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও আনুগত্য খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **"সত্যিকার অর্থে খলীফা ছাড়া ইকামাতুস সালাত বা নামায কায়েম হতে পারে না আর একইভাবে রসূলের আনুগত্যও খলীফা ছাড়া হতে পারে না। কেননা রসূলের আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য হল, সবাইকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে দেওয়া। এমনিতে তো সাহাবীরাও নামায পড়তেন আর বর্তমান যুগের মুসলমানরাও নামায পড়ে। সাহাবীগণও (রা.) হজ্জ করতেন আর বর্তমান মুসলমানরাও হজ্জ করে। তাহলে সাহাবী এবং বর্তমান যুগের মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক হল, একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকার কারণে সাহাবীদের মধ্যে আনুগত্যের চেতনা পরম মানে উপনীত ছিল ... কিন্তু আনুগত্যের এই**

চেতনা আজকালকার মুসলমানদের মধ্যে নেই। কেননা নিযাম বা ব্যবস্থাপনা ছাড়া আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব যখনই খিলাফত হবে তখনই রসূলের আনুগত্য করা হবে...। যদি খিলাফত না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের নামাযও নষ্ট হবে, তোমাদের যাকাতও হারিয়ে যাবে আর তোমাদের হৃদয় থেকে রসূলের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্যও লোপ পাবে।" (তফসীরে কবীর, সূরা নূর, ২য় খণ্ড, ৩২৭-৩২৯)

অ-আহমদীদের দৃষ্টিতে খিলাফতের আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি

বন্ধুগণ! মুসলিম উম্মাহ্ একথাটি খুব ভালোভাবে জানে, এই উম্মতের অধঃপতন এবং পশ্চাদপদতার একমাত্র কারণ হল, খিলাফত হতে বঞ্চিত থাকা আর এর আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য শুধু এবং শুধুমাত্র খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাঝেই নিহিত। একথা স্বীকার করে ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সংখ্যায় আহলে হাদীস পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, **"যদি জীবন সায়াহ্নে পুনরায় একবার নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়ে যায় তাহলে হতে পারে ইসলাম ধর্মের বিশৃঙ্খল অবস্থা সুধরে যাবে বা সুশৃঙ্খল হয়ে যাবে আর অসন্তুষ্ট খোদা পুনরায় দয়াপরপশ হবেন। আর ঘূর্ণিপাকে নিপতিত ইসলামরূপী নৌকা হয়তো কোনভাবে এই বিপদ থেকে রেহাই লাভ করে নিরাপদ তীরে পৌঁছে যাবে।"** (কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত আল্ বদর, ১০-১৭ই মে ২০০৭ সংখ্যা)

জুলফিকার আলী শাহ্ বেরেলভী সাহেব 'চেরাগ রাহনুমায়ে জাহাঁ'তে লিখেন, **"যদি খলীফা না থাকেন তাহলে বিশ্ববাসীর সংশোধন কে করবেন? তাই খলীফার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের জন্য শ্রেয় হল, খোদার খলীফার সন্ধান করে (তাঁর) আনুগত্য করা। সব সময় খলীফার উপস্থিতি আবশ্যক।"** ('চেরাগ রাহনুমায়ে জাহাঁ, পৃ: ৪-৬)

অনুরূপভাবে শাহেদ বদর ফালাহী সাহেব সাপ্তাহিক 'নতুন দুনিয়া' পত্রিকায় লিখেন, **"খিলাফত ছাড়া ধর্ম জয়যুক্ত হতে পারে না আর ন্যায়বিচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না এবং শিরকপূর্ণ ব্যবস্থাপনা নির্মূল হতে পারে না আর না-ই নামায পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যাকাতের পুরো ব্যবস্থাপনা কার্যকর হতে পারে না আর আল্লাহ্‌র রসূলের পূর্ণ আনুগত্যও হতে পারে না এবং মুসলমানদের অবস্থারও সংশোধন হতে পারে না। খিলাফত বিহীন জীবন কাটানো অজ্ঞতার শামিল বরং বেঁচে থাকাও অর্থহীন। খিলাফত ছাড়া ইসলাম পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও খোড়া ও ল্যাংড়া।"** (সাপ্তাহিক 'নতুন দুনিয়া', ১১ই মার্চ, ১৯৯২)

আল্লামা ইকবাল লিখেন,

'তা খিলাফত কি বিনা, দুনিয়া মে হো ফের ইসতোয়ার'
'লা কেহী সে ঢুনড কার আসলাফ কা কলব ও জিগর'

নিজেদের প্রবীণ বা বুযুর্গদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে কোথাহতে খুঁজে বের করে আনো
যাতে পৃথিবীতে খিলাফত-ব্যবস্থাপনা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোটকথা, আজ আমাদের বিরোধীরাও একথা মানতে বাধ্য যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানবজাতির আধ্যাত্মিকতার পানে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এ কারণেই উম্মতে মুসলিমা দীর্ঘকাল থেকে এই চেষ্টায় রত যে, কাকে খলীফা বানানো যায়। কিন্তু তারা একথাটি বুঝে না, মানুষ নয় বরং খোদা খলীফা বানান। এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি যে, আমি খলীফা বানাবো। পরিতাপ হল, খোদার প্রতিষ্ঠিত খিলাফত এরা মানে না বরং নিজেদের মনগড়া খলীফাকে খোদাকে দিয়ে মানাতে চায়। ইতিহাস সাক্ষী, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা খোদার মনোনীত খলীফার আনুগত্য করেছে ততদিন তারা সেসব কল্যাণের উত্তরাধিকারী হয়েছে যার প্রতিশ্রুতি খোদা দিয়েছেন আর যখনই তারা খোদার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে তখন থেকেই অনবরত ব্যর্থতা আর অকৃতকার্যতার সম্মুখীন হয়েছে। এটিই সেই রহস্য যার প্রতি খোদা তা'লা মানবজাতির মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(সূরা ইবরাহীম : ৮) অর্থাৎ, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো দান করবো আর তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি বড়ই কঠোর। এথেকে সুস্পষ্ট হয়, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আনুগত্য যেখানে মানবের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করছে সেখানে খিলাফতের অস্বীকার এবং অকৃতজ্ঞতা খোদার শাস্তিকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমন লোকদের সম্বোধন করেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, **"আমার শেষ বার্তা হল, যুগ ইমামের কাছে মস্তকঅবনত করো। খোদা যাকে প্রেরণ করেছেন, তাকে গ্রহণ কর। তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা রাখেন। খোদার প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে অস্বীকার করার পর তোমাদের জন্য নিরাপত্তা ও সফলতার কোন পথ খোলা নেই। ...আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ...আজ যদি তোমরা খোদার মনোনীত নেতৃত্বের সামনে মাথা নত কর তাহলে বিশ্বে ইসলামের নব-বিজয়ের এমন এক মহান আন্দোলন শুরু হবে যে, বিশ্বের কোন শক্তিই এর মোকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।"** (জুমুআর খুতবা, ৩রা আগষ্ট, ১৯৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন, **"কুদরতে সানীয়া বা দ্বিতীয় কুদরত খোদার পক্ষ হতে অনেক বড় একটি নিয়ামত। যার উদ্দেশ্য হল, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা আর বিভেদ মুক্ত বা দলাদলি থেকে নিরাপদ রাখা। এটি সেই মালার মত যাতে জামাত পুঁতি বা মুক্তার ন্যায় গ্রথিত থাকে। পুঁতি যদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাহলে সেগুলো সুরক্ষিতও থাকে না আর দেখতেও ভালো দেখায় না। একটি মালায় গাঁথা পুঁতিই খুব সুন্দর ও সুরক্ষিত থাকে। যদি কুদরতে সানীয়া না থাকে তাহলে ইসলাম কখনও উন্নতি করতে পারে না। কাজেই এই কুদরতের সাথে পূর্ণ নিষ্ঠা, ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রাখো আর খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের প্রেরণাকে স্থায়ী রূপ দাও আর এর প্রতি ভালোবাসার প্রেরণাকে এতটা সমৃদ্ধ কর যেন এই ভালোবাসার** মোকাবিলায় অন্য সকল সম্পর্ক তুচ্ছ মনে

হয়। ইমামের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত আর আপনাদের জন্য সব ধরনের নৈরাজ্য এবং বিপদাপদ মোকাবিলায় তিনিএকটি ঢাল।... আমাদের সকল উন্নতির ভিত্তি বা রহস্য খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার মাঝেই নিহিত।” (রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল্ ফযল, ৩রা মে, ২০০৩)

সম্মানিত সুধী! খিলাফত এক ঐশী রাজত্ব, জাগতিক কোন রাজা-বাদশাহ্‌র সাথে এর তুলনা চলে না। কাজেই, আমরা যখন খিলাফতের মাধ্যমে ইবাদত প্রতিষ্ঠার কথা বলি, তখন এর অর্থ কেবল লোকদেখানো নামায, রোযা এবং যাকাত প্রতিষ্ঠা নয় বরং ইবাদতের সত্যিকার চেতনা অনুসারে তা প্রতিষ্ঠা করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সেই কাজের নাম ইবাদত যা খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা হয়। এমনকি মহানবী (সা.) বলেছেন, একজন স্বামী যদি খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে তার স্ত্রীর মুখে একটি লোকমা বা একগ্রাশ খাবারও তুলে দেয় তাহলে সেটিও ইবাদত। মোটকথা, রং,বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা আর মানুষের কল্যাণ ও হিত কামনায় রত থাকা, এতিম, মিসকিন, বিধবা ও দরিদ্রদের প্রতি যত্নবান থাকা ইবাদতের একটি লাজেমী বা অপরিহার্য অংশ। এগুলো ছাড়া নামায-রোযাও সম্পূর্ণ হয় না। বরং মানবের প্রতি সহানুভূতি বিহীন নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝
فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

অর্থাৎ, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে দ্বীনকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে? বস্তুত সে-ই ঐ ব্যক্তি যে এতীমদের তাড়িয়ে দেয় আর মিসকীনদের অন্ন দানে (লোকদের) উৎসাহিত করে না। অতএব এমন নামাযীর জন্য ধ্বংস যারা তাদের নামাযের মর্ম সম্পর্কে উদাসীন এবং লোকদেখানো কাজ করে। এবং যারা দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীও (লোকদের) দিতে নিষেধ করে। (সূরা আল্ মাঊন)

এখন খোদা বলছেন, সত্যিকার ইবাদত প্রতিষ্ঠা মূলত বিশ্ব-খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে আর উক্ত আয়াত বলছে, ইবাদতের মধ্যে গোটা বিশ্বের এতীম ও মিসকীনদের প্রতি যত্নবান থাকাও অন্তর্ভুক্ত। অতএব জানা গেল, খিলাফত ব্যবস্থাপনার বিরোধী সত্যিকার অর্থে নামায-রোযারই বিরোধী নয়, সে এতীমদের তাড়িয়ে দেয় আর মিসকীনদের ক্ষুধার জ্বালায় মারে। এরা এতীম ও মিসকীনদের জন্য যাকাত প্রদান করে না। দিলেও তাদের শাসকরা তা মেরে খায়। অন্যায়ভাবে মিসকীনদের সম্পদ হরণ করে। এরা স্বার্থপর মানুষ। এরা যদি দরিদ্রদের সাহায্য করে তবে তা শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্যই করে। তাদের ইবাদত কোন কাজে আসে না বরং এগুলো লোক দেখানো ইবাদত। যার ভিত্তিই অন্যায়ের ওপর তা তাদেরকে আরো ধ্বংস বা দুর্ভোগের দিকে নিয়ে যাবে।

সত্যিকার ইবাদত প্রতিষ্ঠা সেই খিলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হতে পারে যা না প্রাচ্যের আর না-ই প্রতিচ্যের, না উত্তরের আর না দক্ষিণের। বরং তা গোটা বিশ্বের দরিদ্র, এতীম এবং মিসকীনদের বেদনা অনুভবকারী আর তাদের অধিকার প্রদানকারী হবে। আজ পৃথিবীর বুকে আহমদীয়া জামাত ছাড়া অন্য কেউ এই দাবী করতে পারে না যে, আমাদের মাঝে এমন এক আধ্যাত্মিক নেতা আছেন যিনি আমাদের বেদনায় বিমূঢ় হন। বিশ্বের সকল প্রান্তে বসবাসকারী মু'মিনদের চিন্তা যাকে ব্যতিব্যস্ত বা অস্থির করে তুলে। যিনি পুরো রাত আমাদের জন্য তাঁর প্রভুর সকাশে সিজদায় পড়ে থাকেন। এই ব্যাকুলতা আর ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **“তোমাদের জন্য এক ব্যক্তি আছেন যিনি তোমাদের বেদনায় বিমূঢ়, তিনি তোমাদের ভালোবাসেন, তিনি তোমাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করেন, তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে জ্ঞান করেন, তোমাদের জন্য খোদার সমীপে দোয়ারত থাকেন।”** (বারকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) একবার বলেন, **“আহমদীয়া জামাতের সদস্যরাই সেই সৌভাগ্যবান, যুগ-খলীফা যাদের জন্য চিন্তিত থাকেন যেন তারা সুশিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের স্বাস্থ্যের জন্য যুগ-খলীফা চিন্তিত থাকেন। বিয়ে-শাদির সমস্যা আছে, মোটকথা পৃথিবীতে আহমদীরা যেকোন সমস্যায়ই জর্জরিত থাকুক না কেন, তা ব্যক্তিগত হোক বা জামাতী– এমন নয় যে, এর প্রতি যুগ-খলীফার দৃষ্টি নেই আর এর সমাধানের জন্য তিনি ব্যবহারিক চেষ্টা ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত না হন, তাঁর কাছে দোয়া বা প্রার্থনা না করেন, আমিও এবং আমার পূর্বের খলীফাগণও এমনটিই করে গেছেন।”**

তিনি (আই.) আরো বলেন, **“পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে আমি রাতে ঘুমানোর পূর্বে কল্পনার চোখে পৌঁছে না যাই আর ঘুমানোর পূর্বেও এবং জাগ্রত হওয়ার সময়ও দোয়া না করি।”** (জুমুআর খুতবা: ৬ই জুন, ২০১৪)

কিন্তু অপরদিকে মুসলমান হোক বা অমুসলমান, বিশ্বের সর্বত্র দরিদ্রদের সম্পদ তারা কীভাবে ভক্ষণ করছে আর তাদের ওপর কীরূপ অন্যায়-অবিচার চালাচ্ছে, যেগুলো বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই। যাহোক, এরা যে ধর্মের সাথেই সম্পর্ক রাখুক না কেন, তাদের ইবাদত ইবাদত বলে গণ্য হতে পারে না। বরং আজ ইবাদত প্রতিষ্ঠাকারী হল, একমাত্র খোদার মনোনীত খিলাফত, যা ন্যায়বিচার ও সুবিচারের ভিত্তিতে সবার অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা বলে আর গোটা বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে অবিরাম নেকী বা পুণ্যের পানে আহ্বান করে। আজ নয়তো কাল বিশ্বকে এই খিলাফতের ছায়াতলে আসতেই হবে। কেননা, এখন এছাড়া নিরাপত্তার কোন দূর্গ নেই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উপরোল্লিখিত সূরার ব্যাখ্যায় বলেন, “ইসলামী আইন বা সংবিধান খিলাফতের সাথে সম্পর্কিত আর

খিলাফতের অর্থ হল, সকল মুসলমান যেন এর অধীনস্ত হয়ে যায়। ... আল্লাহ্‌র রাজত্ব মূলত আরশে অধিষ্ঠিত, পৃথিবীতে শুধু তার ছায়া বিরাজমান আর পবিত্র কুরআনে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, প্রতিটি আক্রমণ, যা তাঁর রাজত্বের ওপর হবে, তা মূলত আমাদের ওপর হবে। আর প্রত্যেক শত্রু, যে তাঁর ওপর আক্রমন করবে, সে আমাদের শত্রু হবে আর আমরা স্বয়ং তার মোকাবিলা করবো। এই খিলাফত যখনই প্রতিষ্ঠিত হবে তা আধ্যাত্মিক হবে, যেভাবে আমি স্বয়ং নিজেকে খলীফা বলি। এটি জানা কথা, আমার খিলাফতের অর্থ জাগতিক খিলাফত নয়।... আমি যদি আমার এই দাবীতে মিথ্যা হই তাহলে খোদা স্বয়ং আমাকে শাস্তি দিবেন। আর আমি যদি সত্য হই তাহলে মানুষের বিরোধিতা আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। যাহোক, খিলাফত ব্যবস্থাপনা ছাড়া পৃথিবীতে কোনভাবেই ঐশী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম রাজত্ব আর হতে পারে না। (এ আয়াতগুলোতে) আল্লাহ্ তা'লা এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তোমরা ঐশী রাজত্বের অস্বীকারকারীকে দেখেছ কি? এমন মানুষ কখনোই উন্নত নৈতিক জীবন যাপন করতে পারে না সে অপকর্মে জরিত থাকে আর প্রবৃত্তির তাড়নায় জর্জরিত থাকে। (আল্ মাঊন, তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড)

প্রিয় বন্ধুগণ! আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস হল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা। নবীগণ পৃথিবীতে খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যাবলীর বিকাশস্থল হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁদের পর খিলাফতও সেভাবেই ঐশী গুণরাজির বিকাশস্থল হয় আর খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারীরাও হাবলুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রজ্জুর রঙ ধারণ করে। তারা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে বুলিসর্বস্ব তৌহিদের দাবী করে না বরং খিলাফতের কল্যাণে তারা এক দেহতুল্য হয়ে মূর্তিমান তৌহিদের বিকাশস্থল হয়ে যায়। নবীর পর যুগ-খলীফার নেতৃত্বে পুরো জামাত এক দেহে পরিণত হয়। যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন, **মু'মিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের মত, এর এক অংশে বেদনা অনুভূত হলে পুরো দেহই সেই বেদনা অনুভূব করে।** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আদব)

মোটকথা, কলেমা তৈয়্যবার অর্থ শুধুমাত্র মৌখিকভাবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলা নয় বরং খোদার তৌহিদ বা একত্ববাদের ব্যবহারিক প্রদর্শন করা আর তৌহিদ বা একত্ববাদের ব্যবহারিক প্রদর্শন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"র সাথে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" বলা ছাড়া অর্থাৎ তাঁর শিক্ষার ওপর আমল করা ছাড়া সম্ভব নয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা আয়াতে ইস্তেখলাফে মুসলমানদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, শিরকের মূল উৎপাটন আর মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা মোতাবেক খিলাফতের নেতৃত্বে, এক দেহে পরিণত হয়ে আমল করা ছাড়া ঐশী ইবাদত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যদি তোমরা খিলাফতের নেতৃত্বে এক দেহে পরিণত হয়ে কাজ না করো এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে থাকো আর নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে থাকো তাহলে শুধু মৌখিকভাবে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্"** বলায় কোন লাভ হবে না। যদি মৌখিকভাবে তৌহিদ বা একত্ববাদের ঘোষণা দাও তাহলে সেই শিক্ষার প্রতি ঈমান এনে সৎকর্ম কর আর এক খোদার খলীফার নেতৃত্বে এক দেহে পরিণত হয়ে যাও। যার প্রতিটি অঙ্গ অপর অঙ্গের প্রতি যত্নবান থাকে। অপর অংশের বেদনা অনুভব করে আর তা দূর করতে সচেষ্ট থাকে।

সম্মানিত সুধী! এটি হল সেই খিলাফত, যার হাতে খোদা তা'লা পুরো বিশ্বকে এক দেহে পরিণত করে ব্যবহারিক তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন জাতি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজ নিজ রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছে কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে যখন গোটা বিশ্বের একজন খলীফা হবেন, যিনি পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণের সকল মানুষের বেদনা অনুভব করবেন, তাদের জন্য দোয়া করবেন, তখন খোদার সত্যিকার তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তা হবে কলেমা তাইয়্যেবার মূর্তিমান চিত্র। বিশ্ব আধ্যাত্মিকভাবেও উন্নতি করবে আর জাগতিকভাবেও। এভাবে গোটা বিশ্বে যেখানে এক খোদার সত্যিকার ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে শিরকও নির্মূল হবে। এরপর তারা খোদার ওপর ভরসাকারী হবে আর পৃথিবীর মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যাবে আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ভাষায় খিলাফত এতীমদের পিতা হবে। বিধবাদের সোহাগ আর নিরপরাধ ও মিসকীনদের সহায়ক হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানুষের এই উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। এমন খিলাফত থেকে যে পৃথক হয়ে যাবে সে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করবে।

সম্মানিত সুধী! কিছুটা চিন্তা করে দেখুন! খিলাফতের জন্য ঈমান ও সৎকর্ম হল শর্ত। অবস্থা অনুযায়ী কর্মকে সৎকর্ম বলে। আর যে কর্ম অবস্থা অনুযায়ী নয়, তাকে যুলুম বা অন্যায় বলা হয়। আরবী অভিধানে আছে, **"ওয়াযউশ্ শাইয়ে ফি গাইরে মাহাল্লিহি যুলমুন"** অর্থাৎ কোন বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থানে না রাখা এবং কোন কাজকে যথার্থরূপে না করাকে যুলুম বলা হয়। মোটকথা সৎকর্মের বিপরীত হল যুলুম বা অন্যায়।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তোমাকে ইমাম (অর্থাৎ নবী) বানাতে যাচ্ছি। তিনি নিবেদন করেন, আমার সন্তানদের মধ্য হতেও কি? আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়, কিন্তু যে যালেম হবে অর্থাৎ সৎকর্ম না করবে সে আমার এই প্রতিশ্রুতিভুক্ত নয়। এরপর কাবাগৃহকে পুরো বিশ্বের কেন্দ্র বানানোর উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(সূরা আল্ বাকারা: ১২৬) অর্থাৎ, **মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানাও।** অর্থাৎ, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত কর তাহলে তোমরা ইমামতের কল্যাণরাজি লাভ করবে। সেই কল্যাণ– যার কেন্দ্র হল কাবাগৃহ। যা মূলত আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস বা প্রস্রবন।

এই আধ্যাত্মিক জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **যেভাবে মসজিদ কাবাগৃহের স্মরণ বা স্মৃতিকে অম্লান রাখে অনুরূপভাবে খিলাফত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্মরণকে অম্লান রাখে। এটি সেই নির্দেশ যা আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে দিয়েছিলেন,**

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

(সয়রে রূহানী, পৃ: ১৫৪)

কাজেই, সৎকর্মের দাবী হল, আজ আমরাও খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে ইব্রাহীমের আদর্শকে অবলম্বন করি। আর মাকামে ইব্রাহীম হল, **“আসলামতু লিরাব্বিল আলামীন”** (অর্থাৎ, আমি তো বিশ্বজগতের প্রভুর সমীপে আত্মসমর্পণকারী) এর ধ্বনি উচ্চকিত করার নাম। এই উদ্দেশ্যেই কাবাগৃহের ভিত্তি রচনা করা হয়েছিল। যার জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে আর এরপর তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের মাধ্যমে আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির রহস্য এতেই নিহিত যেন (আমরা) সেই খিলাফতের হাত ও বাহু হয়ে বিশ্বে এক ও অদ্বিতীয় খোদার তৌহিদ প্রচারকারী হই। যাতে গোটা বিশ্ব এক খোদার ঐশী রাজত্বের অধীনে এসে যায় আর এক নবীর শরীয়ত অনুযায়ী কাবাগৃহকে নিজেদের তৌহিদের কেন্দ্র বানিয়ে এথেকে উৎসারিত প্রকৃত শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে ধনী-দরিদ্র, বাদশাহ্-ফকির আর রাজা-প্রজা সবাই খোদার দৃষ্টিতে একই কাতারে দণ্ডায়মান আর বিশ্ববাসী নিজ জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

সম্মানিত সুধী! যেমনটি বলা হয়েছে, খোদা তা'লা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের সাথে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আরো বলেছেন, **‘ইন্নাল্লাহা লা ইউখলিফুল মিয়াদ’** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এই নীতিটি দৃষ্টিতে রেখে পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দিলে যেখানে যেখানে **‘আল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি’**র উল্লেখ রয়েছে সেখানে মূলত নবুয়্যতের পাশাপাশি খিলাফতেরও উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক স্থানে আধ্যাত্মিক জীবনকে খিলাফতের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সূরা আত্ তীন এ আল্লাহ্ তা'লা বলেন***Ñ***

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ
رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

অর্থাৎ, মানব ইতিহাস সাক্ষী যে, আমরা মানুষকে বিবর্তনের সর্বোত্তম প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। এরপর (তার নিজের অপকর্মের কারণে) আমরা তাকে আসফালা সাফেলীন বা হীন থেকে হীনতর অবস্থায় নামিয়ে দিয়েছি আর তারা অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে। এরপর বলেছেন–

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অর্থাৎ, কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে, (অর্থাৎ যারা খিলাফতের সাথে যুক্ত আছে)। তারা আসফালা সাফেলীন বা হীন থেকে হীনতর অবস্থায় নিপতিত হওয়া থেকেই কেবল রক্ষা পাবে না বরং বলা হয়েছে–

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

অর্থাৎ, তাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদানও রয়েছে। খোদা তা'লা তাদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

একইভাবে অন্য আরেকটি সূরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

(সূরা আল্ আসর) অর্থাৎ, যুগের কসম! নিশ্চয় মানুষ এক বড় ক্ষতির মাঝে রয়েছে। সেসব লোক ছাড়া যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে আর পরস্পরকে সত্য কথা ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

এই সূরাতে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, **শেষ যুগে সকল মানুষ– সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান, সবাই ক্ষতির মাঝে থাকবে কেননা সবাই ঈমান ও সৎকর্ম হীন থাকবে। মুসলমানদের হৃদয় থেকে আশার কিরণ নিভে যাবে। তারা শক্তিধর জাতীসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রভাবিত হবে। কিন্তু একটি দল ব্যতীত যারা ঈমান ও সৎকর্মরূপী সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর থাকবে আর খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে খিলাফতের সাথে যুক্ত থাকবে। বরং খিলাফতের কল্যাণে তারা নিজেরাও সত্য কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর অন্যদেরকেও সত্যের তবলীগ করতে বা উপদেশ দিতে থাকবে।** (সূরা আল্ আসর, তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৭)

তাদের ওপর বিপদাপদ আসবে, দুঃখ-কষ্টের প্লাবন বইতে থাকবে। তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলার চেষ্টা করা হবে। তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে বাঁধা দেওয়া হবে এবং শির্ক করতে বাধ্য করা হবে। তাদের জন্য ইবাদতের দ্বার রুদ্ধ করা হবে। কিন্তু তারা এসব কষ্ট ও কাঠিন্য হাসিমুখে সহ্য করবে। নিজেরাও সহ্য করবে আর অন্যদেরকেও ধৈর্যের উপদেশ দিবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **“এসব আয়াত থেকে এ সত্য কথাটি সুস্পষ্ট হয়, মু'মিনদের ধর্ম– জাতীয় ধর্ম হয়ে থাকে, তার পবিত্র বাসনা শুধুমাত্র তার ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমিত থাকে না বরং গোটা মানবজাতি পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। সে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক শক্তিশালী সাহায্যকারী হয় এবং সকল ছোট ও বড়কে এক জামাতভুক্ত করতে চায়। সে শুধু নিজেই পুণ্যবান হতে চায় না বরং এটিও চায়, আমার সঙ্গীও যেন নেক বা পুণ্যবান হয় আর পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তি এরূপ সুদৃঢ় হয় যে, কোন ভূমিকম্প এতে কাঁপুনি ধরাতে না পারে।... যে জাতীর লোকদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেই জাতীকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। তারা অবশ্যই জয়যুক্ত হয়।”** (সূরা আল্ আসর, তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫৭৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার সেসব অধম বান্দার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **“খোদা তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি বিপদাপদ নাযিল করেন, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নয় যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে বরং এ জন্য যাতে তারাআরো বেশি ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। তাদেরকে চরম ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু নিমজ্জিত করার জন্য নয় বরং এই জন্য যাতে তারা সেসব মনি-মানিক্যের উত্তরাধিকারী হয় যা তৌহিদ বা একত্ববাদরূপি সমুদ্রের গভীরে বা পাতালে রয়েছে। তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু ভষ্মিভূত করার জন্য নয় বরং এজন্য যাতে খোদা তা'লার কুদরত বা মহিমারাজি প্রকাশিত হয়। তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয় এবং অভিসম্পাত করা হয় আর তাদেরকে সকল প্রকার কষ্ট-যাতনা দেওয়া হয় এবং দুঃখ দেওয়া হয় আর বিভিন্ন প্রকার অপলাপ তাদের সম্পর্কে করা হয়, আর কুধারণা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি তাকে দুঃখ দেয় এবং অভিসম্পাত বর্ষণ করে সে**

আপন মনে খেয়াল করে এটা ভেবে যে, সে অনেক পুণ্যের কাজ করছে ...অতএব সে ধৈর্য ধারণ করতে থাকে, এমনকি নির্ধারিত বিষয় স্বীয় নির্ধারিত সীমায় পৌঁছে যায় তখন ঐশী আত্মাভিমান সেই গরীব বা অসহায়ের জন্য জাগ্রত হয় আর একটি মাত্র ঝটকায় এসব শত্রুকে টুকরো-টুকরো করে ফেলে।" (আনওয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৫২-৫৩)

গালিগালাজ শুনে দোয়া করো আর কষ্ট পেয়ে আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান কর,
অহমিকার অভ্যাস দেখে তুমি বিনয় প্রদর্শন কর,
মানুষের রাগ ও ক্রোধ দেখে তুমি কোন দুঃখ কোরো না।
মনে রেখ! বৃষ্টির স্বাদ পেতে হলে গরমের তীব্রতা তো সইতেই হবে।

সম্মানিত সুধী! আজ যেখানে অন্যান্য জাতি নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যের ওপর অবিচার চালাচ্ছে বা অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পদ হরণের চেষ্টা করছে, সেখানে আহমদীয়া খিলাফত–বিরোধীদের পক্ষ হতে নিজ অনুসারীদের দেয়া সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আর নিজ জামাতকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে, সকল মানুষের দুঃখ-বেদনা ভাগ করে নেওয়ার এবং তাদেরকে শান্তি প্রদানের আর ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম চেষ্টারত। যা একথার বাস্তব প্রমাণ বহণ করে, ভবিষ্যতে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের নিশ্চয়তা আমেরিকাও দিতে পারে না,রাশিয়া এবং চীনও দিতে পারে না, জাপান, ইউরোপ এবং এশিয়াও দিতে পারেনা, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ বা পরাশক্তিও দিতে পারে না। বরং কেবলমাত্র খোদা তা'লা-ই এই নিশ্চয়তা দিতে পারেন। আর আজ এর জন্য কেবল একটিই মাধ্যম খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন আর তা হল, এই শেষ যুগে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খোদার মনোনীত **'খিলাফত'**। যে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে খোদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর স্বয়ং নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনে।

প্রিয় বন্ধুগণ! আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি আজ শুধুমাত্র ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত আর ইসলামের পুনর্জীবন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে আর এর পূর্ণতা খিলাফতের মাধ্যমে নির্ধারিত। ঐশী খিলাফতের নেতৃত্বে এই আধ্যাত্মিক মিশন সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব উপাস্য ধ্বংস হবে। আর মিথ্যা খোদা স্বীয় ঈশ্বরত্বের সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর সেসব মন্দ শক্তিও মরবে যারা সেসব মিথ্যা উপাস্যকে গ্রহণ করতো। নতুন পৃথিবী আর নতুন আকাশ সৃষ্টি হবে। এখন সেই দিন সন্নিকট যখন সত্যের সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। আর ইউরোপ সত্য খোদা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। এরপর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, প্রবেশকারীরা বড় জোরের সাথে এতে প্রবেশ করবে আর তারাই বাদ পড়ে যাবে প্রকৃতিগতভাবে যাদের হৃদয়ের দরজা বন্ধ আর যারা জ্যোতি নয় বরং অন্ধকারকে ভালোবাসে। অচিরেই সকল ধর্ম ধ্বংস হবে কেবল ইসলাম ছাড়া। আর সকল অস্ত্র ভেঙ্গে যাবে কেবল ইসলামের ঐশী অস্ত্র ব্যতিরেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা দাজ্জালিয়্যাতকে টুকরো টুকরো না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ভাঙ্গবে না আর ভোঁতাও হবে না। সেই সময় সন্নিকট, যখন খোদার সত্য বা খাঁটি তৌহিদ যা অরণ্যে বসবাসকারী আর সকল শিক্ষা থেকে বঞ্চিতরাও নিজেদের ভেতর অনুভব করবে, তা সকল সকল দেশে ছড়িয়ে পড়বে। সেদিন না কোন কল্পিত কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত আর না কোন কল্পিত উপাস্যের অস্তিত্ব থাকবে। আর খোদার একটি হাতই কুফরীর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিবে কিন্তু কোন তরবারী দ্বারা নয় আর না কোন বন্দুক দ্বারা। বরং চেষ্টারত আত্মাদের জ্যোতি দান করার মাধ্যমে আর পবিত্র হৃদয়সমূহের ওপর নূর বা জ্যোতি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে। তখন আমি যা বলছি সেসব কথা সহজেই বুঝতে পারবে।"** (মজমুয়া ইশতিহারাত, ২য় খণ্ড)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **"হে লোকসকল, স্মরণ রেখ! তাদের শত্রুতায় ইসলামের কোন ক্ষতি হতে পারে না। তারা পোকা-মাকড়ের মত আপনা-আপনিই মরে যাবে। ইসলামের নূর বা জ্যোতি প্রতিনিয়ত উন্নতি করবে। খোদা তা'লা বিশ্বজুড়ে ইসলামের জ্যোতিকে বিস্তৃত করতে চেয়েছেন, খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাকে সম্মান দান করব আর তোমার কর্মকাণ্ডে কল্যাণ সৃষ্টি করব, এমনকি রাজা-বাদশাহ্‌ও তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। এখন হে মোল্লার দল! হে কৃপণের দল! যদি শক্তি থাকে তাহলে খোদা তা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী সমূহকে অকার্যকর বা ব্যর্থ করে দেখাও। সব ধরণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা কর, কোন প্রকার প্রতারণা করতে বাকী রেখ না, তারপর দেখ! খোদার হাত বিজয়ী হয় না-কি তোমাদের হাত।"** (তবলীগে রেসালত, ২খণ্ড, পৃ: ৯২)

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, **"আমি জোরালো দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর খোদা তা'লার কৃপায় এক্ষেত্রে আমার জয় সুনিশ্চিত। আর যতটুকু দূরদৃষ্টির ভিত্তিতে আমি দেখছি, তাতে গোটা বিশ্বকে আমার সত্যতার অনুবর্তী দেখতে পাচ্ছি। আর অচিরেই আমি এক মহান বিজয় লাভ করব কেননা, আমার কথার সমর্থনে অন্য আরেকটি মুখ কথা বলছে এবং আমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য অন্য আরেকটি হাত কার্যকর, বিশ্ব তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু আমি দেখছি। আমার ভেতর এক ঐশী সত্তা কথা বলছে, যে আমার প্রতিটি শব্দে এবং অক্ষরে অক্ষরে প্রাণ সঞ্চার করছে আর উর্ধ্বলোকে একটি প্রাণচাঞ্চল্য ও আবেগ-উচ্ছাস সৃষ্টি হয়েছে। যিনি একটি পুতুলের ন্যায় মাটির এই ঢেলাকে দণ্ডায়মান করেছেন। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার জন্য তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়নি, সে অচিরেই দেখতে পাবে, আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে নই।"** (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, , পৃ: ৩০৩)

হে লোকেরা! এখন এই বাগানেই শান্তি ও আরাম রয়েছে
হে বাউণ্ডুলে বা ভবঘুরের দল! এখনও সময় আছে, ত্বরিৎ আসো
হে আমার স্বজাতি! এদিকে আসো, কেননা সূর্য উদিত হয়েছে
অন্ধকার উপত্যকায় তোমরা কেন দিবারাত্র বসে আছো।

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**
ওয়াকফে যিন্দেগী, বাংলাডেস্ক, লন্ডন।

The Guardian
International Editition/Opinion/Sri Lanka
(Tue 13 Jan 2009)

আমাকে খুন করার এ দৃশ্যপটটি স্বাধীনতার পরাজয় হিসেবে নয় বরং আশা করি একে প্রেরণা হিসেবেই দেখা হবে

লাছান্থা বিক্রমাতুঙ্গে

** [এটি হচ্ছে শ্রীলঙ্কান সানডে লিডার পত্রিকার সম্পাদকের লিখা অনন্য-সাধারণ একটি প্রবন্ধের সম্পাদিত রূপ, যেটি ১১ জানুয়ারীর সানডে লীডার-এর সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত হয়েছিল। এর গ্রন্থণাকারী যিনি; ১৯৯৪ সনে তিনিই ছিলেন কাগজটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রবন্ধটি প্রথম 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় মঙ্গলবার, ১৩ জানুয়ারী, ২০০৯ তারিখে তাকে গুলি করে হত্যা করার তিন দিন পর। ৩ দিন পূর্বে কাজে যাবার সময় তিনি অপরিচিত এক বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন। মৃত্যুর মাত্র ক'দিন পুর্বে তিনি এ সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন বলে মনে হয়।*

এক দশক পূর্বে প্রকাশিত তার নিবন্ধটি নির্ভীক সাংবাদিকতার পেশাগত দায়বদ্ধতার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত। সংবাদ মাধ্যমের পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কিত তার এ বক্তব্যটি আজও যেন জীবন্ত।]

একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের ছাড়া অন্য কোন পেশাজীবি লোকদেরকে তাদের কাজের জন্যে জীবন দিতে হয় না– আর শ্রীলঙ্কায় তা দিতে হয় সাংবাদিকতার পেশাজীবি লোকদেরকেও।

বিগত অল্প ক'বছর ধরে ইনডিপেন্ডেন্ট গণমাধ্যমটি বার বারই আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছে। এদের বৈদ্যুতিন আর ছাপাখানাগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, বোমা ছোঁড়া হয়েছে, সীলগালা করা হয়েছে এবং বন্ধ করে দেয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো।

অসংখ্য সাংবাদিককে হয়রানী করা হয়েছে, ভয় দেখানো হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে। এ সবগুলোর শ্রেণীভুক্ত হবার সম্মানে ভূষিত হয়েছি আমি, আর এখন আমি বিশেষভাবে সর্বশেষটির শিকারে পরিণত হতে যাচ্ছি।

সুদীর্ঘ এক সময় ধরেই আমি সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত আছি। বস্তুত ২০০৯ সালটি সানডে লিডার-এর পঞ্চদশ বছর হবে। এ সময়ের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় অনেক পরিবর্তনই সাধিত হয়েছে আর আপনাদেরকে এটা বলার প্রয়োজন আমার নেই যে সেই পরিবর্তনের বৃহত্তর অংশটিই হয়েছে মন্দের দিকে। নিজদেরকে আমরা দেখেছি এক গৃহ-যুদ্ধের মাঝখানে, যা সেসব নায়কদের দ্বারা নির্মমভাবে চালানো হচ্ছে, যাদের রক্ত-পিপাসা অপরিসীম। সন্ত্রাস, আর তা সন্ত্রাসীদের দ্বারাই চলানো হোক কিংবা রাষ্ট্র দ্বারাই চালানো হোক, তা কালের এক প্রথায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত নরহত্যাই হচ্ছে সেই প্রাথমিক যন্ত্র যা দ্বারা, রাষ্ট্র চাচ্ছে স্বাধীনতা সাধনের উপায়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আজকের এ দিনে সাংবাদিকরাই যদি হয় এর লক্ষ্যস্থল, তবে কালকে এর লক্ষ্যস্থল হবে বিচারকরা। এর যে কোন পেশাজীবিদের জন্যই এ ঝুঁকিটা বরাবরই ছিল উচ্চতর কিংবা তা থেকে সামান্য কম। তাহলে কেনই বা আমরা এটা করি? আর এটা নিয়ে প্রায়শ:ই আমি বিস্মিত হই। মোটের ওপর আমিও তো একজন স্বামী আর বিস্ময়কর তিনটি শিশুর পিতা। আমার পেশার প্রতিও তো আমার কিছু দায়-দায়িত্ব এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে, যা আমার পেশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর সেটা দেশের আইন কিংবা সাংবাদিকতার আইনই হোক না কেন। সেটা কি ঝুঁকির সমমূল্য রাখে? অনেক লোকই তো আমাকে বলে যে এটি সেরূপ কিছু নয়। বন্ধুরা আমাকে আইন-ব্যবসায় ফিরে যেতে বলে। স্বয়ং ভগবানই জানেন, নিরাপদতর জীবিকার জন্যে এটিই উত্তম কি-না।

উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্যরা বিভিন্ন সময়েই চেয়েছে যেন আমি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হই আর এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হই, যাতে তারা আমার পছন্দের কোন মন্ত্রীত্ব আমাকে দান করতে পারে। শ্রীলঙ্কায় সাংবাদিকরা যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, সেগুলো স্বীকার করে অনেক কূটনীতিবিদই আমাকে তাদের দেশসমূহে নিরাপদ প্রবেশ-পথ এবং বসবাসের অধিকার গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। অন্য আর যা কিছুই আমি চাইতাম, তারা আমাকে তা-ই দিতো, কিন্তু তার পরও আমি আমার নিজ পছন্দ থেকে সরে আসি নি।

কিন্তু এমন এক আহ্বান, যেটা উচ্চ-ক্ষমতা, যশ, ধন-দৌলত আর নিরাপত্তারও ওপরে, সেটি হচ্ছে নিজ বিবেক-বুদ্ধির আহ্বান।

সানডে লীডার পত্রিকাটি ছিল বরাবরই বিতর্কমূলক এক পত্রিকা। কারণ, এটাকে আমরা তেমনই বলতাম, যেমনটি আমরা এটাকে দেখতাম। এটা তাসের ইসকাপনই হোক, এক চোর কিংবা খুনীই হোক, সে নামেই আমরা এটাকে ডেকে থাকি। কোন ছদ্মনামে আমরা এটাকে ডাকি না। তদন্তমূলক সেসব প্রবন্ধ আমরা এটাতে ছেপে থাকি, যেগুলোর দালিলিক প্রমাণও বিদ্যমান থাকে, যা সেসব সজীব নাগরিকদের দ্বারা সমর্থিত হয়, যারা নিজেদের প্রতি ঝুঁকি নিয়েও এসব বস্তু আমাদের কাছে পাঠিয়ে থাকে। অপবাদের পর অপবাদ আমরা প্রকাশ করেছি এবং এই পনের বছরে একবারও কেউ আমাদেরকে ভুল প্রমাণিত করতে কিংবা সফলভাবে নির্যাতনও করতে পারে নি। মুক্ত সংবাদ-মাধ্যম এক আয়না হিসেবে কাজ করে, যখন জনসাধারণ নিজকে Sons maskara এবং styling gel ভাবে। আমাদের কাছ থেকে আপনারা আপনাদের জাতির অবস্থা অবহিত হতে পারেন আর বিশেষত: আপনাদের সন্তানদের উত্তম এক ভবিষ্যত গড়তে আপনাদের দ্বারা নির্বাচিত লোকদের ব্যবস্থাপনা কেমন, তা জানতে পারেন। সেই আয়নায় মাঝে মাঝে এমন ছবিও আপনারা দেখে থাকেন, যা আনন্দদায়ক কোন ছবি নয়। কিন্তু বসার আসনের গোপনীয়তা নিয়ে আপনারা যখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন সাংবাদিকরা, যারা আপনাদের ওপর আয়না ধরে আছে, নিজদের ওপর বিশাল এক ঝুঁকি নিয়েই জনসমক্ষে তা তুলে ধরে। সেটিই হচ্ছে আমাদের আহ্বান, আর এটাকে আমরা অপসৃত হতে দেই না।

সংখ্যাগুরু মানুষদের মতামতকে প্রশ্নাতীত ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ করতে সানডে লীডার কখনোই কোন নিরাপত্তা চায় নি। চলুন, এবার আমরা এটিই প্রত্যক্ষ করি, আর এটিই হচ্ছে সংবাদ-পত্র বিক্রয়ের মোক্ষম উপায়। অপরপক্ষে, আমাদের সংবাদ-পত্রটি যেহেতু বহু বছর ধরেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিক্রয় হয়ে আসছে, প্রায়শ:ই আমরা এতে এমন সব কথা প্রকাশ করে থাকি, যেগুলোকে অনেক মানুষই অরুচিকর বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ-সঙ্গতিপূর্ণভাবেই আমরা এ মতটির সমর্থন করে থাকি যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করতে হলে এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, সন্ত্রাসবাদের মূল-কারণটিও চিহ্নিত করতে হবে, আর তা সন্ত্রাসবাদের দূরবীণের মাধ্যম নয়, বরং ইতিহাসের আলোকে এর সরকারকে শ্রীলঙ্কার জাতিগত বিবাদকেই বিবেচনায় আনতে হবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথাকথিত যুদ্ধটি যে রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত সন্ত্রাস, তার বিরুদ্ধেও আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছি এবং শ্রীলঙ্কাই যে বিশ্বে একমাত্র দেশ, যেটি এর নাগরিকদের বিরুদ্ধে বোমা হামলা চালায়, সে ঘটনাটিও আমরা গোপন রাখি নি।

এসব কথা বলার কারণে আমাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করা হয়েছে; আর এটা যদি হয় কোন বিশ্বাস-ঘাতকতা, তবে সেই লেবেলটিও আমরা গর্বের সাথেই পরিধান করি। অনেকে আবার এ সন্দেহও করে থাকে যে, সানডে লীডার-এর রাজনৈতিক কোন কর্মসূচী আছে; এটা ঠিক নয়। বিরোধী-দলের সমালোচনা করার চাইতে আমরা যদি সরকারের সমালোচনাই অধিক করে থাকি, তবে তা এ কারণে যে, আমরা বিশ্বাস করি, ওজর দেখানো যে এক অপভাষা, তার মাধ্যমে মোক্ষ লাভে ভাল কোন ফল লাভ হয় না। স্মরণ রাখতে হবে যে, অল্প যে ক'বছর ধরে আমরা কাজ করে যাচ্ছি, সে সময়ে ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিটিই ক্ষমতায় ছিল; আর এ সময়ে যে ক্ষেত্রেই তাদের বাড়বাড়ি আর দুর্নীতি ঘটেছে, তা প্রকাশ করে আমরা তাদের গাত্রদাহের সৃষ্টি

করছি। বস্তুত আমাদের প্রকাশিত হতবিহ্বলকারী এসব খবরই হয়তো সেই সরকারের পতনে সহায়তা করে থাকবে।

যুদ্ধের বিষয়ে আমাদের যে অনীহা, সেটির ব্যাখ্যায় একথা মনে করা উচিত হবে না যে, আমরা তামিল টাইগারদেরকে সমর্থন করি। এল.টি.টি.ই. হচ্ছে বিশ্বের সবচে' নির্দয় আর রক্ত-পিপাসু সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এটিকে যে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তামিল নাগরিকদের অধিকারকে অস্বীকার করা, নির্দয়ভাবে তাদের ওপর গুলি চালানো আর বোমা-বর্ষণ করাটা কেবল অন্যায়ই নয়, বরং তা সিংহলীদেরকেও অপমান করে, যাদের দাবী হচ্ছে– তারা ধর্মসমূহের হেফাজতকারী, আর এই বর্বরতায় তা চিরদিনের মতই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় এবং সেন্সরসীপের কারণে এগুলোর অধিকাংশই জনসাধারণের অজ্ঞাতে থাকে।

এছাড়া আরো যেসব বিষয় রয়েছে তা হচ্ছে– সেনাবাহিনীর দখলে থাকা দেশটি উত্তর ও পূর্ব অংশের তামিলদেরকে চিরদিনের মতই দেশটির ২য় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে রেখেছে, যারা তাদের সকল আত্ম-সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যুদ্ধোত্তর যুগে "উন্নয়ন" আর "পুনর্গঠন"-এ ধূঁয়া তুলে তোমরা যে তাদেরকে পকেটস্থ করে রাখতে পারবে, তেমনটি কল্পনা করো না। যুদ্ধের যেসব ক্ষত রয়েছে, সেগুলো চিরদিনই দগদগ করতে থাকবে, আর সে কারণে তোমাদেরকে আরো বেশী তিক্ত ও ঘৃণ্য এক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। যে সমস্যাটি রাজনৈতিক সমাধানের এখতিয়ারভুক্ত, তা এভাবেই এক পচনশীল ক্ষতে পরিণত হয় আর তা থেকে পড়ন্ত বেলা পর্যন্ত বিবাদ চলতেই থাকে। আমাকে যদি রাগান্বিত আর হতাশাগ্রস্থ মনে করা হয়, তবে তা এ কারণেই যে, আমার স্বদেশবাসীদের অধিকাংশই এবং সবগুলো সরকারই আমার এ লেখা দেয়ালে এতটা স্পষ্টভাবে লিখিত দেখতে পায় না।

এটি সর্বজনবিদিত যে, দু'-দু'বার আমি পাশবিক আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলাম, আর আরেকবার আমার বাড়ীটির ওপর মেশিন গান থেকে গুলি চালানো হয়েছিল। সরকারের বক-ধার্মিকতাপূর্ণ নিশ্চয়তা সত্বেও এসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ কোন তদন্ত করা হয়নি, আর আক্রমণকারীরা কখনো গ্রেফতারও হয়নি।

এই সবগুলো ঘটনাতে এটি বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত যে, এ আক্রমণগুলোর পেছনে সরকারের অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। পরিণামে আমাকে হত্যা করা হলে সরকারই তা করবে। এর পশ্চাতে যে কারণটি বিদ্যমান, যা অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত, তা হচ্ছে– প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাক্ষসে আর আমি সিকি শতাব্দী ধরেই পরস্পর বন্ধু ছিলাম। বস্তুত: আমি এমনটাই মনে করি যে, আমি হলাম স্বল্পসংখ্যক সেসব মানুষের অন্যতম, যারা ধারাবহিকভাবেই তাকে; তার প্রথম নাম ধরে ডাকে এবং তার সাথে কথা বলার সময় সিংহলীদের পরিচিত সম্বোধন 'ওয়ে'– সেটিই ব্যবহার করে।

সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জন্যে তার ডাকা সাময়িক সভাগুলোয় যদিও আমি উপস্থিত হই না, কমপক্ষে একমাস অতিবাহিত হতে না হতেই রাতের বেলায় ব্যক্তিগতভাবে কিংবা কাছের বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউজ-এ তার সাথে আমি সাক্ষাৎ করি এবং পুরোনো দিনের ঘটনা নিয়ে রসিকতাও করি। তার বিষয়ে এখানে কিছু মন্তব্য পেশ করা মানানসই-ই হবে:

মাহিন্দা, ফ্রিডম পার্টির প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন পেতে ২০05 সালে যখন তুমি চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলে, তখন এ কলাম ছাড়া আর কোথাও অধিকতর আন্তরিকভাবে কেউ তোমাকে অভ্যর্থনা জানায় নি। বস্তুত: এক দশকের ঐতিহ্য ভেঙ্গে আমরা তোমাকে সর্বত্রই তোমার নামে পরিচিত করেছি। মানবাধিকার আর উদার মূল্যবোধের প্রতি তোমার যে প্রতিশ্রুতি, তা এতটাই সুপরিচিত ছিল যে, মুক্ত বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতই তোমাকে আমরা সর্বত্র পরিচিত করে দিয়েছিলাম। অতঃপর তোমার বোকামীপূর্ণ এক কর্মের মাধ্যমে তোমাকে 'হ্যাম্বানটোটার সহায়কের' কলঙ্কে জড়ানো হলো। এরপর অনেক সাধ্য-সাধনার পর সেই অর্থ ফেরত দিতে তোমাকে অনুপ্রাণিত করে সেই ঘটনার অবসান ঘটালাম। ইতোমধ্যে বেশ ক'সপ্তাহ পর তোমার যশে বিশাল এক আঘাত নেমে এলো, আর সেটি ছিল এমনই এক আঘাত, যা থেকে বাঁচতে আজো তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো।

তুমি নিজেই আমাকে বলছো যে, সভাপতির পদমর্যাদা লাভের কোন লালসা তোমার নেই, আর এর জন্যে তুমি লালায়িতও ছিলে না। এটা আপনা-আপনিই তোমার অধিকারে এসেছে। তুমি আমাকে বলেছো যে, তোমার ছেলেরাই তোমার জন্যে মহা এক আনন্দের বিষয়, আর রাষ্টযন্ত্র চালানোর যে দায়িত্ব, তা তোমার ভাইদের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে সময় কাটাতেই তুমি বেশী ভালবাসো। এখন এটা তোমাদের সবার কাছেই পরিস্কার হয়ে গেছে, যারা দেখছে যে, সেই যন্ত্রটি ঠিকভাবেই চলছে, কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েরা হারিয়েছে তাদের বাপকে।

আমার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আজ আমি এটাই জানি যে, প্রচলিত বকধার্মিকতাপূর্ণ সব হৈ চৈ-ই তোমরা করবে আর পুলিশ ডেকে দ্রুতই এক ব্যাপক তদন্ত শুরু করবে। কিন্তু অতীতের সব তদন্তের মতোই এ তদন্তেও কোন সুফল পাওয়া যাবে না। সত্য বলতে কি, আমরা উভয়েই জানি যে আমার মৃত্যুর পশ্চাতে কে রয়েছে, কিন্তু তার নাম উচ্চরণ করার সাহস আমাদের নেই। কেবল আমার জীবনই নয়, বরং তোমাদের জীবনও এর ওপরই নির্ভর করে।

আমার কথা বলতে গেলে এটি ভেবেই আমি সন্তুষ্ট যে, আমি চলেছি বুক ফুলিয়ে, আর কোন মানুষের কাছেই নতি স্বীকার করিনি, আর এ পথে আমি একা চলিনি। সংবাদ-মাধ্যমের অন্যান্য শাখার সাথীরাও ছিল আমার সহযাত্রী, যাদের অধিকাংশই এখন মৃত, বিনা-বিচারে জেলখানায় ধুঁকছে, কিংবা দূরের কোথাও

নির্বাসনে আছে। অন্যরা মৃত্যুর সেই আঁধারে চলাফেরা করছে, স্বাধীনতার ওপর তোমার সভাপতিত্ব যেটা নিক্ষেপ করেছে, যে স্বাধীনতার জন্যে একদা তুমিও কঠিন এক সংগ্রাম করেছো। তোমাকে কখনোই এটি বিস্মৃত হতে দেয়া যাবে না যে, তোমার তত্বাবধানেই আমার মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। আমি জানি যে, এ কথা শুনে তুমি রাগান্বিতই হবে। আর আমি এটিও জানি যে আমার হত্যাকীরদেরকে সংরক্ষণ করা ছাড়া তোমার করার আর কিছুই নেই; তুমি এটিও খেয়াল রাখবে যে, দোষী-ব্যক্তিরা যাতে কখনোই দন্ডিত না হয়। পছন্দ বলতে আসলে তোমার কিছুই নেই।

আমাদের মিশনকে সমর্থন করার জন্যে সানডে লীডার-এর প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া আমি আর কী-বা বলতে পারি। জনপ্রিয়তাহীন ব্যাপারগুলো আমরা সমর্থন করছি, সেসব লোকের পক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছি, যারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে না, সেসব মানুষকে আমরা শৃঙ্গশোভিত করেছি যারা ক্ষমতার দাপটে এতোটাই স্ফীত হয়ে গেছে যে তাদের ভিত্তিকে ভুলে বসেছে। দুর্নীতি আর জনগণের কষ্টার্জিত করের টাকার অপচয়কে অনাবৃত করেছি এবং এটি নিশ্চিত করেছি যে, কালের সজ্ঞবদ্ধ প্রচারণা যা-ই হোক, আপনারা যেন বিপরীত এক মতও শুনতে পান। এ কারণে আমাকে আর আমার পরিবারকে এমনই এক মূল্য দিতে হয়েছে, যা দেবার কথাটি আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম আর সেজন্যে সর্বদাই আমি প্রস্তুতও ছিলাম। এ পরিণতিটিকে বাধা দিতে নিরাপদ কোন আশ্রয় নিতে কিংবা কোন সাধানতা অবলম্বনের কিছুই আমি করিনি। আমার ঘাতককে আমি এটা জানাতে চেয়েছি যে, আমি তার মত এক ভীতু নই, যে মানব-ঢালের আড়ালে থেকে হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যু-দন্ডাদেশ দিচ্ছে। এতগুলো মানুষের মাঝে আমি কোন্ ছাড়? অনেক দিন থেকে এটি প্রকাশিত যে, আমার জীবনটা নিয়ে নেয়া হবে আর তা কার দ্বারা হবে। কিন্তু যা প্রকাশিত হয়নি, সেটি হচ্ছে– তা কখন বাস্তবায়িত হবে।

সানডে লীডার পত্রিকাটি যে তোফা এ যুদ্ধটি চালিয়ে যাবে, তা-ও লিখা হয়েছিল। কারণ, এ যুদ্ধটি আমি একাকী চালাইনি। এ নেতার মৃত্যুর আগে আমাদের মধ্য থেকে আরো অনেককেই যে মরতে হবে এবং মরবে, সেটি সুনিশ্চিত। আমি আশা করি, ‘আমার এ সংঘটিকে স্বাধীনতা-যুদ্ধের এক পরাজিত-শক্তি’ হিসেবে দেখা যাবে না, বরং সেসব মানুষের জন্যে এক প্রেরণা হিসেবেই দেখা যাবে, যারা বেঁচে থাকবে এবং যারা এ প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিবেই। বস্তুত: আমি আশা করি যে, এটা সেই শক্তিতে গতি সঞ্চার করবে, যা আমাদের প্রিয়-এ মাতৃভূমিতে মানব-স্বাধীনতার নতুন এক যুগের অগ্রদূত হবে। আমি এ আশাও করি যে, এটা তোমাদের প্রেসিডেন্ট-এর চোখ, এ বিষয়েও খুলে দেবে যে, দেশ-প্রেমের নামে যত অধিক লোককেই খুন করা হোক না কেন, মানবিক মনন তা সহ্য করেই উন্নতি লাভ করবে।

মানুষ প্রয়াশ:ই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, এমন ঝুঁকি আমি কেনই বা নিই, আর তারা আমাকে এ-ও বলে যে, এ সময়টি হচ্ছে আমার পর্যুদস্ত হবার পূর্বক্ষণ। বস্তুত: আমি সেটা জানি, আর এটি হচ্ছে অপরিহার্য-এক বিষয়। কিন্তু এখনই যদি আমরা কথা না বলি, তবে যারা কথা বলতে জানে না, তাদের জন্যে কথা বলার আর কেউই থাকবে না, হোক না তারা জাতিগত সংখ্যালঘু, সুবিধা-বঞ্চিত, কিংবা নির্যাতিত। সাংবাদিকতা-জীবনের সবটা জুড়েই যে আদর্শটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তা হচ্ছে জার্মান ধর্মতত্ব বিশারদ মার্টিন নিমোলার-এর সেই আদর্শটি। যুবা বয়সে সে ছিল বাইবেলোক্ত ‘শেম’ থেকে উৎপন্ন জাতির বিরোধী এক লোক, যে ছিল হিটলারের প্রশংসাকারী। যা হোক, নাৎসিবাদ যখন জার্মানীর দায়িত্ব গ্রহণ করলো, তখন নাৎসিবাদের আসল রূপ তার দৃষ্টিগোচর হলো। হিটলার কেবল ইহুদীদেরকেই মূলোৎপাটন করতে চাইলো না, বরং যে কোন লোককেই সে ভিন্ন এক মতাদর্শে পরিচালিত করতে চাইলো। নীমোলার তখন মুখ খুললেন এবং তার কষ্ট যাতে বেড়ে যায়, সেজন্যে তাকে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্যাচুয়ানের ডাকাও বন্দী-শিবিরে আটক রাখা হলো এবং অচিরেই তাকে প্রাণদন্ড দান করা হলো। তাকে যখন কারারুদ্ধ করা হয়, তখন সে একটি কবিতা লিখে, যেটা আমার ছোট বেলায় প্রথম যখন আমি পাঠ করি, তখন থেকেই তা আমার মনকে আন্দোলিত করে আসছে, আর তা হচ্ছে–

‘প্রথমবার তারা আসে ইহুদীদের পক্ষ থেকে, আর আমি তাদের সাথে কথা বলিনি, কারণ আমি ইহুদী নই;

এরপর তারা আসে সাম্যবাদীদের পক্ষ থেকে, আর আমি তাদের সাথেও কথা বলি নি, কারণ আমি সাম্যবাদী নই;

এরপর তারা আসে শ্রমিক-সমিতির পক্ষ থেকে, আর আমি তাদের সাথেও কথা বলিনি, কারণ আমি কোন শ্রমিক-সজ্ঞবাদীও নই;

সবশেষে তারা আসে আমার জন্যে, আর তখন আমার পক্ষে কথা বলতে কেউই বাদ যায় নি।”

অন্য কিছু যদি তোমার স্মরণে না-ও থাকে, তবুও এটি স্মরণ রেখো: তোমার জন্যে তোমার নেতাই সেখানে বিদ্যমান আছে, তা তুমি সিংহলীই হও, কিংবা তামিল, মুসলমান, নিম্ন কোন জাতির, কিংবা হও ভিন্নমত পোষণকারী কিংবা কোন পঙ্গু। মাথা নত না করে আর অকুতোভয় থেকে এর কর্মচারীরা সেই শক্তি নিয়েই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যা তোমরা অর্জন করেছো। সেই প্রতিশ্রুতিটি মান্য করা হয়ে গেছে বলে মনে করবে না। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে, আমরা সাংবাদিকরা যেসব কুরবাণী করে থাকি, সেগুলো আমাদের নিজেদের গৌরব কিংবা সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যে নয়; বরং সেগুলো করা হয় তোমাদেরই জন্যে। তাদের কুরবানী তোমরা আশা কর কি-না, সেটি হচ্ছে ভিন্ন এক বিষয়। আমার কাছে তা যে কী, সেটা খোদা-ই অবগত আছেন, আর আমি কেবল চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’
- ইমাম মাহদী (আ.)

“ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই”
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১০২)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংগে ধর্মীয় বিষয়ে মত-পার্থক্য: কি এবং কেন?

(১) প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সময়-কাল সম্পর্কিত মত-পার্থক্য:

প্রশ্ন হলো: আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত সত্যিকার অর্থে ‘ঐশী-প্রতিশ্রুত’ খিলাফতের অস্তিত্ব কোথাও আছে কি? এবং এই মত-পার্থক্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সৎসাহস এ পর্যন্ত কেউই দেখাতে পারছেনা কেন?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন:

“কিছু লোক ‘ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আ’মেলুস সা’লেহাতে লাইয়াসতাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম’ এর বিষয়টি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা ‘মিনকুম’-(তোমাদের মধ্য হতে)-এর অর্থে শুধু সাহাবাদেরকে (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন, খিলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো, খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধঃপতনের অশুভ গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো। এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে, ঐ সকল ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খিলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে, তবে মুসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল? যেহেতু মানুষের কোন স্থায়ীত্ব নেই, তাই আল্লাহ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্ত্বার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব) রূপে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু তিরিশ বছর মানে, মূর্খতাবশত: সে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদাতা'লার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় কেবল তিরিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবে, আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তবুও কোন পরওয়া নেই” (শাহাদাতুল কুরআন পৃ: ৩৪, ৫৮)।

পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুহাম্মদী উম্মতের ‘খাতামুল-খোলাফা’ হিসেবে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ ‘সুম্মা সাকাতা’ (অতঃপর তিনি চুপ করলেন) এবং সমাগত ইমাম মাহদী (আ.)-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান কালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে– সংক্ষেপে এটাই হলো বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক পরিকল্পনার রূপরেখা। এই খেলাফত-ভিত্তিক রূপরেখার বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করছে বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য এবং ইসলামের মহাবিজয়।

(১.৩) সূরা কিয়ামা, সূরা তাকভির এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের বর্ণনা: চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যতিক্রম-ধর্মী এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হওয়ার সাক্ষ্য-প্রমাণ।

(২) সূরা কিয়ামা: “ওয়া খাসাফাল কামারু ওয়া জুমেয়াশ শামসু ওয়াল কামার।” অর্থ: “এবং চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণের অবস্থায়) একত্রিত করা হইবে।” (সূরা কিয়ামা : ৯-১০)।

(৩) সূরা তাকভির: ২ “এযাশ শামসু কুই-য়িরাত” অর্থ: “যখন সূর্যকে আবৃত করা হইবে।”

(৪) উপরোক্ত দুটি সূরায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী কেবলমাত্র মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের বিষয়টির প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নয়, বরং ইহলোকের প্রাকৃতিক জগতের সুপরিচিত অবস্থাবলীও ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই সূরা দুটির অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত কতকগুলো বিষয় পরকালের জন্য প্রযোজ্য হয় না। ফলত: আয়াতগুলোর এরূপ অর্থ হতে পারে: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমনের সময় তাঁর সত্যতার চিহ্নস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে (বায়হাকী, দারকুৎনী) এবং যদিও তা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটবে, তথাপি এতে অস্বাভাবিকতাও পরিলক্ষিত হবে। এই আয়াতটিতে উপর্যুক্ত হাদীসের ঘটনার প্রতিও ঈঙ্গিত থাকতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৮৯৪ খৃষ্টীয় সনের রমযান মাসে এই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সনে সংঘটিত হয়েছে আবারও পশ্চিম গোলার্ধে।

(৫) চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী:

হযরত রসূল করীম মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: "ইন্না লে মাহদীনা আয়াতায়নে লামতাকুনা মুনযু খাককেস সামাওয়াতে ওয়াল আরযে ইয়ানকাসিফুল কামারু লে আওয়ালে লায়লাতেম্ মিন রামাযানা ওয়াতান কাসিফুশ্ শামসু ফিন নিসফে মিনহু"।

অর্থঃ "নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে, যা আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং সূর্য গ্রহণ হবে (সূর্য গ্রহণের ২৭, ২৮, ২৯ তারিখে) মধ্যম তারিখে।" (দারকুতনী-১৮৮ পৃষ্ঠা এবং আরো ৬টি প্রসিদ্ধ কিতাবে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে)।

(৬) উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতেও শেষ যুগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যজনকভাবে মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত রয়েছে।

[নোট: উল্লেখিত গ্রহণদ্বয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে হয়ে গেছে। আযাদ পত্রিকা (উর্দু লাহোর, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ)। সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট, লাহোর, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, এবং সমকালীন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দ্রষ্টব্য। মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব লিখিত 'কিয়ামত নামার' ভূমিকা (উর্দু) এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুরেশ্বর নিবাসী মরহুম মাওলানা জান শরীফ সাহেব প্রণীত 'মদীনা কল্কি অবতারের ছফিনা' দ্রষ্টব্য।]

(৭) উল্লেখ্য যে, হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) হিজরী ১৩০৬ (১৮৮৯ইং)সনে আল্লাহ তা'লার নির্দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্চর্যজনকভাবে ১৩১১ হিজরীর ১৩ই রমযান (২১/৩/১৮৯৪ইং) চন্দ্র গ্রহণ এবং ২৮ শে রমযান সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৮৯৫ সনে পশ্চিম গোলার্ধে এই গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে।

(৮) এরূপ গ্রহণ সংঘটিত হওয়ার ১২ বছর আগে 'বারাহীনে আহমদীয়া' নামক গ্রন্থে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি পূর্বেই (১৮৮২ সনে) ঘোষণা করেছিলেন।

(৯) আগমনকারী হযরত ঈমাম মাহদী (আ.) বলেছেন: "এইরূপ গ্রহণের ঘটনা পৃথিবীর শুরু হইতে কোন রসূল বা নবীর যুগে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। কেবল প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে ইহা হওয়া নির্ধারিত ছিল। সকল ইংরেজী ও উর্দু পত্রিকা এবং সকল দক্ষ জ্যোতির্বিদরা এই বিষয়ের সাক্ষী যে, আমার যুগেই, (যাহার প্রায় ১২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে) এই নির্ধারিত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ রমযান মাসে সংঘটিত হইয়াছে। যেরূপে অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্রুপে এই গ্রহণ রমযানে দুইবার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এই দেশে ও দ্বিতীয়বার আমেরিকায় হইয়াছে এবং দুইবারই এই তারিখগুলিতে হইয়াছে, যাহার প্রতি হাদীস ইঙ্গিত করিতেছে। যেহেতু এই গ্রহণের সময় প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবীকারক আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেহ ছিল না এবং আমার ন্যায় অন্য কেহ এই গ্রহণকে নিজের মাহদী হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করিয়া শত শত বিজ্ঞাপন এবং উর্দু, ফার্সী ও আরবী পুস্তক পৃথিবীতে প্রকাশ করে নাই, সেহেতু এই আসমানী নিদর্শন আমার জন্য নির্ধারিত হইল। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের ১২ বৎসর পূর্বে খোদাতা'লা ইহা সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এইরূপ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এই সংবাদ 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল।" ("হাকীকাতুল ওহী" পৃ: ১৫৯)।

(১০) চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী এবং ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকারকের ঘোষণার কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

(ক) উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন:

* "যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীর মহিমা ও আযমতকে কেহ অস্বীকার করতে সাহস করে, তাহলে সে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পেশ করুক।" ('তোহফায়ে গোলড়বিয়া' পুস্তক')।

(খ) * "বিরুদ্ধবাদীগণের অবস্থা দেখিলে আমার বড়ই দুঃখ হয়। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যে সকল লক্ষণ পূর্বে তাহারা নিজেরই পেশ করিত, এখন তাহা পূর্ণ হওয়ার পর তাহারা আপত্তি করিতেছে যে ঐগুলি সঠিক নহে। উদাহরণ স্বরূপ তাহারা বলে যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হাদীসটি প্রমাণিত নহে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হউক, ঘটনার দ্বারা খোদাতা'লা যে হাদীসকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাদের মুখের কথায় কি উহা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমার সত্যতায় শুধু চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নহে, হাজার হাজার প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। একটা যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এ কথা কি প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা? হায়! তাহারা আমার সহিত শত্রুতা করিয়া শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি জোরের সহিত পেশ করিয়া থাকি এবং বলি যে, ইহা আমার সত্য 'মা'মুর মিনাল্লাহু' (আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার প্রমাণ। যে হাদীসকে তোমরা অনুমানরূপ কালিতে লিখিয়াছিলে, ঘটনা উহাকে নিশ্চয়তায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।" (তাবলীগে হক, পুস্তক, পৃ: ৫০)।

(১১) * 'ইয়ারো জো মরদ আনে কো থা ওত আচুকা, ইয়ে রাজ তুমকো শামস ও কমর ভি বাতাচুকা'।

(অর্থাৎ- বন্ধুরা সব সবাই শুন, যে প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আসার কথা তিনি এসে গেছেন। এই ঘটনার কথা চন্দ্র–সূর্যও বলে দিল, সেই ব্যক্তিই ইনি।)

(১২) প্রশ্ন হলো: আকাশে প্রকাশিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণের বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন-কাল যেভাবে চিহ্নিত হয়েছে তা সেই দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণ নয় কী? দ্বিতীয়ত: এখন পর্যন্ত হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর এতদসংক্রান্ত সুস্পষ্ট ঘোষণার বিপক্ষে কোন যুক্তি–সঙ্গত সদুত্তর প্রদানের সৎসাহস কেউ দেখাতে পারছেন না কেন?

(১৩) আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ঘোষণা করেছেন:

* 'ছাফ দিলকো কসরতে এজাজ কি হাজত নেহী– এক নিশাঁ কাফি হ্যায় গর দিলমে হো খৌফে কিরদিগর।'

(অর্থাৎ: স্বচ্ছ-হৃদয়ের জন্য অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই। একটি নিদর্শনই যথেষ্ট যদি হৃদয়ে খোদা-ভীতি থাকে।)

(১৪) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (ধর্মীয় সংস্কারক) হিসেবে আগমনকারী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা:

সূরা হিজর (১৫:১০) "ইন্না নাহনু নাযযালনাজ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন"

অর্থ: "নিশ্চয় আমরাই এই উপদেশ বাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী"।

হাদীসঃ আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী-মিশকাত, কিতাবুল এলম।

(১৫) হযরত রসূল করীম মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

"ইন্নাল্লাহা ইয়াবয়াছু লি-হাজিহিল উম্মাতি আলা রাসে কুল্লি মিয়াতি সানাতিন মাঁই ইউজাদ্দেদু লাহা দ্বীনাহা"।

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন।"

পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর এবং সংশ্লিষ্ট সহী হাদীসের (আবু দাউদ) ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে আলোকপাত করেছেন। একটি পুস্তকের ('আহবান'-প্রকাশ কাল ১৯০৩ খৃ.) বরাতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি এবং ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) লিখেছেন:

"প্রত্যেক একশত বৎসরে মুজাদ্দিদের আগমন সম্পর্কে মুসলমান মাত্রই জানে এবং সম্ভবত: কোন লোকেরই অজানা নাই যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন: "প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় আল্লাহ তা'লা নিশ্চয় মুজাদ্দিদ পাঠাইবেন। ধর্মের যে অংশে কোন প্রকার অনাচার দেখা দিবে, তিনি সেই অংশের সংস্কার করিবেন।" পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি: "নিশ্চয় আমরা এই যিকর (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী' (১৫ : ১০)। আল্লাহ তা'লা তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মুজাদ্দিদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'লার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং আল্লাহর নিকট হইতে ওহী পাইয়া হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন তদনুযায়ী ধর্মের সংস্কার ও সজীবতা সাধন করিবার জন্য বর্তমান শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক। অথচ (১৯০৩ সনে) ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া উনিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দী চলিতেছে- প্রকাশক) শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া তাঁহার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী ঘোষণা করিবার পূর্বেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উচিত ছিল অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার অনুসন্ধান করা এবং তাঁহার নিকট 'আমি খোদাতা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসিয়াছি'– এই শুভ সংবাদ শুনবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত থাকা।

তিনি ঐ পুস্তকে আরো লিখেছেন: হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর উপর মুসলিম উম্মতের ওলী, দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কাশ্‌ফ (দিব্যদৃষ্টি), রুইয়া (সত্যস্বপ্ন) ও ইলহামের (ঐশীবাণী) ইঙ্গিত এই যে, হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই মহান প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসিবেন, যাঁহাকে হাদীসের গ্রন্থসমূহে মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

"ওয়ালাল মাহদীয়ু ইল্লা ঈসাবনু মারইয়াম" অর্থাৎ 'ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নাই' (ইবনে মাজা পুস্তক)। যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনিও নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ডাকে সাড়া দিবার লোক অল্পই দেখা গিয়াছে। ফল কথা, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় যে একজন মুজাদ্দিদ আসেন একথা নূতন নহে বা লোকের অজানা নহে। আল্লাহ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক ছিল। অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দী চলিতেছে)।

তিনি আরো লিখেছেন এবং প্রশ্ন করেছেন: সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে কি?

এখন এই সমস্যার আর একটা দিক দেখা আবশ্যক। ইসলামের এখন এমন কোন সংকট উপস্থিত হইয়াছে কি, যাহার জন্য এখন একজন সংস্কারক আসা আবশ্যক? এই বিষয়ে চিন্তা করিলে পরিস্কার দেখা যায়, এখন ইসলামের ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই সংকট উপস্থিত হইয়াছে।" (আহবান, পৃ. ১০-১১)।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য একটি প্রশ্ন: খোদার সাহায্যের সময় আসে নাই কি?

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সকল কথা সামনে রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন, এখন খোদা তা'লার বিশেষ শক্তি দেখাইবার সময় আসিয়াছে কিনা? এখনও কি পবিত্র কুরাআনের সূরা হিজর: ১০ আয়াতে 'ইসলামকে রক্ষা করিব' বলিয়া আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দান করিছেন, তাহা পূর্ণ হওয়ার সময় আসে নাই? এখনও যদি আল্লাহ্‌র বিশেষ সাহায্য ও শক্তি প্রকাশের সময় না আসিয়া থাকে, তবে ঐ সময় কখন আসিবে, তাহা আমাকে কেহ বলিয়া দিবেন কি? একদিকে প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহ ঘোষণা করিতেছে যে, ইসলামের সপক্ষে ঐশী শক্তি ও সাহায্য প্রকাশের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, অন্যদিকে শতাব্দীর শিরোভাগ উপস্থিত হইয়া সন্দেহাতীতরূপে প্রকাশ করিতেছে যে, হজরত রসূল করীম (স.) এর মারফত আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে মুজাদ্দিদ পাঠাইবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তদনুযায়ী কোন মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক। ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দি চলিতেছে- প্রকাশক) এই সকল আবশ্যকতা থাকা সত্ত্বেও এখনও যদি মুজাদ্দিদ না আসিয়া থাকেন, তবে খোদার ওয়াস্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, ইসলামের আর কী অবশিষ্ট রহিল? এইরূপ হওয়া কি– ('আমরাই ইহার রক্ষক') বলিয়া আল্লাহ তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, উহার বিরোধী হবে না? ইহাতে কি মুজাদ্দিদের আগমন সংক্রান্ত হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে না? ইহা হইতে কি এই কথা প্রমাণিত হইবে না যে, ইসলামের উপর বিপদ আসিল অথচ খোদাতা'লা উহার জন্য স্বীয় প্রতাপ দেখান না?

আমার দাবী স্বতন্ত্র রাখিয়া এখন এই সকল কথা চিন্তা কর এবং আমাকে উত্তর দাও।

আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলে তোমাকে ইসলাম শূন্য হইতে হইবে। আমি সত্যিই বলিতেছি যে, কুরআন শরীফের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহতা'লা তাঁহার ধর্মের সাহায্য

করিয়াছেন এবং হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। ঠিক যখন আবশ্যক হইয়াছে, আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রসূল করীম (সা.)-এর দেওয়া শুভ-সংবাদ মোতাবেক আল্লাহতা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের বাণী সত্য। বড়ই হৃদয়হীন সে ব্যক্তি, যে এই বাণীকে মিথ্যা মনে করে।

আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন: 'আমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে'।

বর্তমান শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া আমার যে দাবী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি জোরের সহিত বলিতেছি যে, আল্লাহ তা'লা আমাকে মা'মুর (আদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) করিয়াছেন। আমার এই দাবীর পর বাইশ (বর্তমানে ১২০ প্রকাশক) বৎসরের বেশী সময় অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমি আল্লাহ তা'লার সাহায্য পাইতেছি। তোমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য আল্লাহ তা'লার পক্ষ হইতে ইহা যথেষ্ট। কারণ, অনাচার দূর করিব বলিয়া আমি যে মুজাদ্দিদ হইবার দাবী করিয়াছি, তাহা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সাব্যস্ত। আজ যাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে বস্তুত: তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, আল্লাহ ও তাঁহার রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে। আমার স্থলে আর কাহাকেও ধর্ম–সংস্কারকরূপে না দেখাইয়া দিয়া আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। কারণ সর্বত্র অনাচার দেখা দিয়াছে এবং যুগের অবস্থা বলিয়া দিতেছে যে, ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যক। কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দেয় যে, এইরূপ অনাচারের সময় উহার হেফাযতের জন্য ধর্ম সংস্কারক আসিয়া থাকেন। হাদীস বলিয়া দেয় যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসেন।

হেফাযতের আবশ্যকতা

সুতরাং যখন ধর্ম সংস্কারের আবশ্যকতা আছে, ধর্মের সংস্কার ও হেফাযতের বিধান আছে, তখন এই আবশ্যকতা ও বিধান অনুযায়ী যিনি আসিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ না করিবার পথ মাত্র দুইটি হয় অন্য কোন সংস্কারক দেখাইয়া দিতে হইবে, আর না হয় কুরআন ও হাদীসের এই সমূদয় বাণীকে মিথ্যা বলিতে হইবে। এমন লোকও দেখা যায়, যাহারা বলিয়া থাকে যে, ইসলামের হেফাযতের কোন আবশ্যকতা নাই। ইহারা মারাত্মক ভুল করিতেছে। দেখ, এক ব্যক্তি বাগান রচনা করে বা ঘর তৈয়ার করে, সে কি ঐ বাগান বা ঘরের যত্ন নেয় না এবং শত্রুর হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে না? অন্ততঃপক্ষে ইহা কি তাহার কর্তব্য নহে– বাগান রক্ষা করিবার জন্য উহার চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়, আগুন হইতে ঘরকে বাঁচাইবার জন্য কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হয় এবং বজ্রপাত হইতে রক্ষার জন্য তাতে তার সংলগ্ন করা হয়। এই সমুদয় ব্যাপার হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, হেফাযত করা মানব-প্রকৃতির অঙ্গীভূত একটি ব্যাপার। আল্লাহ তা'লার পক্ষে স্বীয় ধর্মের হেফাযত করা কি সঙ্গত ব্যাপার নহে? নিশ্চয়ই তিনি স্বীয় ধর্মের হেফাযত করেন এবং প্রত্যেক বিপদের সময় উহাকে রক্ষা করেন। এখন ইসলামের হেফাযতের আবশ্যকতা আছে বলিয়া তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।" (আহ্বান, পৃ. ১৫-১৬)।

সূরা আল বুরূজ (৮৫: ২-৪)

"বুরূজ" সম্পন্ন আকাশের কসম এবং প্রতিশ্রুত দিবসেরও কসম এবং একজন সাক্ষ্য-দানকারী এবং যার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে তার (কসম)।"

উপরোক্ত তিনটি আয়াতের ব্যাখা: ইসলামের পূনর্জাগরণের জন্য প্রতিশ্রুত ঐশী-ব্যবস্থা–

ইসলামের আকাশে সুউচ্চ অবস্থানে দন্ডায়মান তারকার ন্যায় বারজন ব্যক্তিত্ব, যাঁদেরকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দিদ' অর্থাৎ 'প্রাণ-সঞ্চারী ধর্ম-সংস্কারক' বলা হয়ে থাকে। ইসলামের আধ্যাত্মিক সূর্যের পরে ইসলামের আকাশে তাঁরা তারকার মত অবস্থান গ্রহণপূর্বক মানবকে পথ-প্রদর্শন করবেন। যখন সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তার লাভ করবে, এ সকল 'বুরূজ' বা আধ্যাত্মিক তারকা একের পর এক প্রতি হিজরী শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের সত্যতা, কুরআনের বিশুদ্ধতা ও মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ-প্রসূতা বার বার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করবেন।

'প্রতিশ্রুত দিবস'-বলতে সেই দিনকে (সময়) বুঝাতে পারে, যেদিন ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আগমন করবেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক দিন রয়েছে, যাকে 'প্রতিশ্রুত দিন' বলা যেতে পারে, যেমন বদরের যুদ্ধের দিন, খন্দকের যুদ্ধের অবসান দিবস, মক্কা বিজয়ের গৌরবময় দিন । কিন্তু ঐ সকল দিবস ছাড়া আরেকটি প্রতিশ্রুত দিবস আছে, যখন মহানবী (সা.) হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে তাঁর এক প্রতিনিধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে দ্বিতীয়বার আর্বির্ভূত হবেন এবং ইসলাম নবজীবন লাভ করে অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত হবে। 'প্রতিশ্রুত দিবস' দ্বারা ঐ দিনকেও বুঝায় যেদিন ধর্মপরায়ণ মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) লাভ করবেন।

প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক ধর্ম-সংস্কারক এক একজন 'শাহেদ' অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁরা 'মাশ্‌হূদ'(সাক্ষ্য-প্রাপ্ত) হিসেবেও পরিগণিত। কেননা আল্লাহ্ তাঁদের সত্যতার পক্ষে নিজেই নিদর্শনাদি প্রকাশ করে থাকেন। আল্লাহ্‌র সাহায্যে তাঁরা 'মু'জিযা ও কারামত' দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু যেভাবে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয়, প্রতিশ্রুত মসীহ হলেন শাহেদ (সাক্ষ্যদাতা) এবং মহানবী (সা.) হলেন 'মাশহূদ'। এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) তাঁর কথা, যুক্তি-তর্ক, তাঁর লেখা এবং তাঁর নিজ অস্তিত্বের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা যে নিদর্শনসমূহ দেখাবেন তা দিয়ে তিনি আঁ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তখন মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-তাঁর উম্মতে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে নিশ্চয়ই আগমন করবেন– পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ এক হিসাবে মাশহুদও বটে। কেননা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য স্বয়ং রসূলুল্লাহই (সা.) দিয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ উভয়েই পরস্পররের 'শাহেদ' বা সাক্ষ্যদাতা এবং পরস্পরের 'মাশ্‌হূদ' বা সাক্ষ্য-প্রাপ্ত।" (কুরআন মজীদের তফসীর-এর আলোকে)।

[চলবে]

জলসা সালানা যুক্তরাজ্য ২০১৯

অনুষ্ঠানসূচী

প্রথম দিবস: শুক্রবার, ২রা অগাস্ট ২০১৯	**বাংলাদেশ সময়**	**যুক্তরাজ্য সময়**
দুপুরের খাবার ও জুম'আর প্রস্তুতি	বিকাল ৪:৩০	দুপুর ১১:৩০
জুম'আর খুৎবা এবং জুম'আ ও আসরের নামায	বিকাল ৬:০০	দুপুর ১:০০
উদ্বোধনী অধিবেশন		
পতাকা উত্তোলন ও দোয়া	**রাত ৯:২৫**	**বিকাল ৪:২৫**
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ	রাত ৯:৩০	বিকাল ৪:৩০
উদ্বোধনী ভাষণ: হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.)		
রাতের খাবার	রাত ১২:৩০	বিকাল ৭:৩০
মাগরিব ও ইশার নামায	রাত ২:০০	সন্ধ্যা ৯:০০
দ্বিতীয় দিবস: শনিবার, ৩রা অগাস্ট ২০১৯	**বাংলাদেশ সময়**	**যুক্তরাজ্য সময়**
তাহাজ্জুদ নামায	সকাল ৮:০০	রাত ৩:০০
ফজরের আযান	সকাল ৯:০১	সকাল ৪:০১
ফজরের নামায	সকাল ৯:৩০	সকাল ৪:৩০
দরসুল কুর'আন	সকাল ৯:৪৫	সকাল ৪:৪৫
সকালের নাস্তা	দুপুর ১:০০	সকাল ৮:০০
দ্বিতীয় অধিবেশন		
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উর্দু নযম	দুপুর ৩:০০	সকাল ১০:০০
জ্ঞান বৃদ্ধির উপায়সমূহ (উর্দু) -- ড. ইজাযুর রহমান, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্য	দুপুর ৩:২০	সকাল ১০:২০
পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ (ইংরেজি) -- মৌলানা ইব্রাহীম নূনান, মুবাল্লিগ-ইন-চার্জ, আয়ারল্যান্ড	দুপুর ৩:৫০	সকাল ১০:৫০
উর্দু নযম	বিকাল ৪:২০	সকাল ১১:২০
মহানবী (সা.) এর পরামর্শরীতি (উর্দু) -- ফযল উর রহমান নাসির, কায়েদ তরবিয়ত, মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্য	বিকাল ৪:৩০	সকাল ১১:৩০
মহিলাদের জলসাগাহে হুযূর (আই.) এর আগমন	**বিকাল ৫:০০**	**দুপুর ১২:০০**
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ		
ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ		
মহিলাদের উদ্দেশ্যে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.) এর ভাষণ		
যোহর ও আসরের নামায	বিকাল ৬:৩০	দুপুর ১:৩০
দুপুরের খাবার	সন্ধ্যা ৭:০০	দুপুর ২:০০
তৃতীয় অধিবেশন		
বিশিষ্ট অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য	রাত ৮:৩০	দুপুর ৩:৩০
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উর্দু নযম	**রাত ৯:০০**	**বিকাল ৪:০০**
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.) এর ভাষণ		
রাতের খাবার	রাত ১২:৩০	বিকাল ৭:৩০
মাগরিব ও ইশার নামায	রাত ২:০০	সন্ধ্যা ৯:০০

তৃতীয় দিবসঃ রবিবার, ৪ঠা অগাস্ট ২০১৯	বাংলাদেশ সময়	যুক্তরাজ্য সময়
তাহাজ্জুদ নামায	সকাল ৮:০০	রাত ৩:০০
ফজরের আযান	সকাল ৯:০২	সকাল ৪:০২
ফজরের নামায	সকাল ৯:৩০	সকাল ৪:৩০
দরসুল হাদীস	সকাল ৯:৪৫	সকাল ৪:৪৫
সকালের নাস্তা	দুপুর ১:০০	সকাল ৮:০০
চতুর্থ অধিবেশন		
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উর্দু নযম	দুপুর ৩:০০	সকাল ১০:০০
ঐশী সাহায্যের উপর মসীহ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ আস্থা (উর্দু) -- মৌলানা আইয়ায মাহমুদ খান, মুরব্বী সিলসিলাহ, ওকালত তাসনীফ, ইসলামাবাদ	দুপুর ৩:২০	সকাল ১০:২০
খিলাফত - আহমদীয়া জামা'তের মর্যাদার প্রতীক (ইংরেজি) -- ড. হাম্মাদ খান, ডিরেক্টর, মেডিকাল সার্ভিসেস, হিউম্যানিটি ফার্স্ট, যুক্তরাজ্য	দুপুর ৩:৫০	সকাল ১০:৫০
উর্দু নযম	বিকাল ৪:২০	সকাল ১১:২০
আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভের উপায়সমূহ (উর্দু) -- মৌলানা আতাউল মুজিব রাশেদ, নায়েব আমীর, যুক্তরাজ্য ও ইমাম, মসজিদ ফযল লন্ডন	বিকাল ৪:৩০	সকাল ১১:৩০
আহমদীয়াতের ১৩০ বছরের উপর একটি পর্যালোচনা (ইংরেজী) -- জনাব রফিক আহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্য	বিকাল ৫:০০	দুপুর ১২:০০
আন্তর্জাতিক বয়'আত সম্পর্কে ঘোষণা ও প্রস্তুতি	বিকাল ৫:৩০	দুপুর ১২:৩০
আন্তর্জাতিক বয়'আত অনুষ্ঠান	**বিকাল ৬:০০**	**দুপুর ১:০০**
যোহর ও আসরের নামায	বিকাল ৬:৩০	দুপুর ১:৩০
দুপুরের খাবার	সন্ধ্যা ৭:০০	দুপুর ২:০০
সমাপনী অধিবেশন		
বিশিষ্ট অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য	রাত ৮:৩০	দুপুর ৩:৩০
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ, আরবী কাসীদা ও উর্দু নযম	রাত ৯:০০	বিকাল ৪:০০
শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য পুরস্কার প্রদান		
আহমদীয়া আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা		
সমাপনী ভাষণ: হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.)		

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

মৌলবী মোহাম্মদ

(পূর্বের ধারাবাহিকতায়-২)

উক্ত গোসলের প্রায় দুই বৎসর পরে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমার বৈঠকখানায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন বুযূর্গ সাহাবী হযরত কুদরতউল্লাহ্ ছানওয়ারী (রা.) কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করেন। তখন তিনি আমার জন্য বহু দোয়া করেছেন এবং তিনি আমার এখান থেকে যাওয়ার সময় বলে যান, এখন হতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তোমার এখানে আল্লাহ্ তা'লার বহু কুদরতের প্রকাশ হতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসরণ ও তাঁর এতায়াত তাঁর সিলসিলার খেদমতকে বুঝায়। তাঁর খলীফা, সাহাবী এবং তাঁর বুযূর্গগণের আগমন তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর রুহানী আগমনকে নির্দেশ করে।

এখানে এটা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাংলাদেশের জামা'তের অধিকাংশ মুরুব্বী-মোয়াল্লেম এবং কর্মী এই জামা'তের সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত। এখানে প্রকাশ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর আদেশে বাংলাদেশের সকল মুরুব্বী-মোয়াল্লেম মোহতরম সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব সদর মুরুব্বী, বর্তমানে নাজের ইসলাহ ইরশাদ এর অধীনে ও পরিচালনায় চার মাস ব্যাপী আহমদনগরের চারদিকে দশ মাইল ব্যাপী তবলিগে খাস এর কাজ চালান হয়।

পাঠক! তখন আহমদনগরের মসজিদ পাকা হয় নি, স্কুল হয় নি এবং বর্তমান আঞ্জুমান নির্মাণও হয় নি। বর্তমান খলীফাও খেলাফতের আসনে আসেন নি এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বর্ণিত সত্যতা প্রকাশ আরম্ভ হয় নি এবং এই অধমও তাঁর অধীনে ও তাঁর ঘনিষ্টভাবে পিছনে পিছনে আসারও সৌভাগ্য লাভ করে নি। একটি স্বপ্ন যে ধরনে এবং যে আকারে সত্যায়িত হয়েছে, এটা কি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অকাট্য প্রমাণ নয়? এটা আহমদীয়াতের ইতিহাসে উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে অঙ্কিত থাকবে। ইন্‌শা'আল্লাহ। অতঃপর আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভ্রাতাগণের বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শিত স্বপ্নগুলোকে একত্রে অপূর্ব সমাবেশ করে কে সেগুলোকে সত্যায়িত করল? এটা কি সেই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা খোদা নন, যিনি এগুলো ঘটালেন?

যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্ন দেখি, তার মাত্র কয়েক বছর আগে আমি আহমদী হই। তখন আমি কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বা উল্লেখযোগ্য অবস্থায় ছিলাম না। নিজস্বভাবে দেশ ভ্রমণের অবস্থা তখনও আমার ছিল না, এখনও নেই। আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি মাত্র।

আহমদনগর এলাকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার বহু নিদর্শনে পরিপূর্ণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্লেগে দেশ উজাড় হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (তাযকেরা, ৩১৪ পৃষ্ঠা)। যথা: 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার ফেরেস্তা পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় কালো চারা গাছ লাগাচ্ছে এবং তা দেখতে অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ ও কুৎসিত এবং ছোট আকৃতির ছিল। যারা চারা লাগাচ্ছিল আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের গাছ? তারা উত্তর দিল যে, এটা প্লেগের বৃক্ষ, যা শীঘ্রই দেশে বিস্তার লাভ করবে।' উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে প্লেগ ও কলেরা দেখা দেয়। প্লেগে ভারতবর্ষে ১৮৯৮-১৯০১ সাল পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। এরই একটি ঝাপটা এই এলাকায়ও পৌঁছায়। ১৯০১ সালের আগে আহমদনগর এক জনবহুল জনাকীর্ণ বস্তি ছিল। তখন এর নাম ছিল নতুন বন্দর। এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদীতে রীতিমত বড় বড় নৌকায় ব্যবসা চলত। এর নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। নদীর উৎসে বাঁধ নির্মাণের জন্য এখন নদীটি শুষ্ক-প্রায়। এক বছর আগে নদীর পারে স্থানীয়

লোকেরা পাথর সংগ্রহ করতে গিয়ে ৪৮ হাত লম্বা এক ময়ুরপঙ্খী নৌকা পায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) এক কবিতায় ভবিষ্যদ্বাণী করেন:

ফরজানোনে দুন্ইয়াকে শহ্রুঁকো উজড়া হ্যাঁয়
আবাদ কারেঙ্গেঁ ফ্যের দিওয়ানে ইয়েহ্ বিরানে

অর্থাৎ, "বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাদের অপকর্মের দ্বারা বসতিগুলোকে ধ্বংস করেছে। এখন তাঁর দেওয়ানা অনুসারীগণের দ্বারা বিরান এলাকাগুলো আবার আবাদ হবে।"

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৯৫০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের বাল্লা এলাকা হতে একটি আহমদী জামা'ত উৎখাত হয়ে ময়মনসিংহ জিলার কটিয়াদী এলাকায় বাস করতে আসে। কিন্তু, সেখান থেকেও তারা অত্যাচারে বিভ্রান্ত হয়ে আহমদনগরে আসে এবং এই এলাকা তাদের দ্বারা আবাদ ও উন্নত হয়। এইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এখানে পূর্ণ হল। উক্ত দুই এলাকা হতে ধর্মের জন্য উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হয়ে একটি ক্ষুদ্র উদ্‌ভ্রান্ত আহমদীয়া জামা'তের দ্বারা এখানে নতুন বসতি স্থাপিত হয়।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রা.) বাংলাদেশে যখন ১৯৬০ সালে আসেন, তখন তিনি আহমদনগরে অবস্থান করেন। তিনি তখন ওয়াক্ফে জাদীদ দফতরের কার্যভার সবে গ্রহণ করেছেন। এর পিছনে তাঁর এক বড় কুরবানীর ঘটনা আছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে বি, এ, পাশ করিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার জন্য লণ্ডনে পাঠান। তিনি প্রায় আড়াই বছর সেখানে পড়েছেন এবং আর ছয় মাস পড়লে ডিগ্রি লাভ করবেন, এমন সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে রাবওয়ায় এসে ওয়াক্ফে জাদীদ দফতরের চার্জ নিতে বলেন। তাঁর কোনো কোনো বন্ধু তাঁকে আরও ছয় মাস থেকে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিকট অনুমতি চাইতে বলেন। কিন্তু, খলীফার আদেশ এসেছে, সুতরাং তিনি অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে এবং কারও কথায় কর্ণপাত না করে অবিলম্বে রাবওয়ায় এসে কার্যভার গ্রহণ করেন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রাহে.) আহমদনগরে আমার বৈঠকখানায় অবস্থান করেন। এটা আগেই বর্ণনা করেছি। তখনকার একটি প্রিয় ঘটনা আজ স্মরণে জাগল। রাত্রিকালে প্রয়োজন বোধে কয়েকজন বিশ্বাসী খোদ্দামকে দক্ষিণ দিকে তাঁর পাহারায় নিযুক্ত করলাম এবং আমি স্বয়ং আমার তিনটি নাবালিকা মেয়ে মোবারেকা বেগম, বুশরা বেগম এবং নাসিরা বেগমকে নিয়ে উত্তর দিকে পাহারায় নিযুক্ত থাকলাম। তখন এটা তাঁকে জানতে দেই নি। বহুপরে তিনি খলীফা হওয়ার পর তাঁকে পুরনো দিনের এই স্মৃতি জানিয়েছিলাম। তিনি এতে বড় খুশি হয়েছিলেন এবং দোয়া করেছিলেন।

এখন পাঠক বলুন, যে সকল ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত হল, কে ঐগুলি পূর্ণ করল এবং পূর্ণ হতে দেখাল? নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্ব-শক্তিমান খোদা ছাড়া কারও ক্ষমতা ছিল না। আহমদনগর জামা'তের মসজিদ ও আহমদীয়া আঞ্জুমান কমপ্লেক্স আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের অকাট্য নিদর্শন স্বরূপ খাড়া আছে ও ইনশা'ল্লাহ্ থাকবে। মসজিদের মিনারা এবং তাতে তারকা ঝলমল করা বহু বুযূর্গানে দ্বীনের সমাবেশ ও আগমনকে নির্দেশ করে। এই সম্বন্ধে উপরে কিছু বর্ণিত হয়েছে। আলেমুল গায়েব ও কাইউম কাদের খোদা অতীতে যা দেখালেন, তার ভবিষ্যৎ তাঁর কল্যাণকর নিপুণ হাত কোথায় নিয়ে পৌঁছাবেন তা তিনি জানেন। যে খোদা তাঁর বান্দার দোয়া শুনেন ও ভবিষ্যতের ঘটনাকে স্বপ্নের তুলিতে অঙ্কন করে তাঁর বান্দাকে দেখান এবং যার অস্তিত্ব নেই তাকে বাস্তবে আনেন, এটা তাঁর কুদরত ও অস্তিত্বের কি অকাট্য নিদর্শন নয়?

এটাই বন্ধুগণের খেদমতে এই অধমের আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

সুতরাং, এই সকল অভিজ্ঞতার জন্য এই অধমের ক্ষুদ্রতম সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সেই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, অসীম, অনন্ত অস্তিত্বের দরবারে কৃতজ্ঞতায় মাথা সিজদায় অবনত করে দিলাম।

{সাবেক ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব প্রণীত 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব' পুস্তক থেকে চয়নকৃত}

Smile Aid
your complete dental healthcare

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. No - 4399
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Oral & Dental Surgery | Teeth Whitening
Dental Fillings | Dental Implant
Root Canal Treatment | Orthodontics (Braces)
Dental Crowns, Bridges | In House Dental X RAY

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVaJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম? ইসলামে শান্তি লাভের পদ্ধতি

খন্দকার আজমল হক

(৩য় কিস্তি)

কুরআন পাকে এরশাদ হয়েছে, "এবং তোমার প্রতিপালক তাগিদপূর্ণ এই আদেশ দিয়েছেন যে তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করিওনা। এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদের উভয়কে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদের ধমক দিবে না। বরং তাদের সাথে সম্মান সূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বল।" "তুমি করুণাভরে তাদের উপর বিনয়ের বাহু অবণত রাখ এবং বল 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে রহম কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিল।" (১৭: ২৪-২৫)

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, "একদা একজন লোক হযরত নবী করীম (সা.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রসূল! মানবজাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট সদয় ব্যবহার ও উত্তম সাহচর্যের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত।" তিনি, বললেন, "তোমার মা।" লোকটি পূণরায় জিজ্ঞাসা করল 'তার পর কে?' তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'এবং তারপর?' তিনি জবাব দিলেন, 'তোমার পিতা।" (বুখারী, মুসলিম- মেশকাত হতে)

সন্তানদের দুর্ব্যবহারের কারণে অনেক সময় পিতা-মাতাকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কোন কোন সময় পিতামাতার প্রতি সন্তানদের দুর্ব্যবহার তাদের মৃত্যুরও কারণ হয়। সম্পদশালী সন্তান থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে বসবাস করতে হয়। এটা বড়ই দুঃখজনক। শরীয়তের নির্দেশ না মানায় পিতা-মাতার এই দুর্ভোগের কারণ।

অনেক মধ্যবিত্ত ও সম্পদশালীদের পরিবারে দাস দাসী রাখা হয়। ইসলাম এসব দাস দাসী ও অধিনস্ত কর্মচারীদের সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন, "এবং মোমেনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাদের প্রতি মমতার বাহু প্রসারিত রাখ।" (২৬: ২১৬)

আল্লাহ আরও বলেন, "এবং সদ্ব্যবহার কর তাদের সাথে, তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে।" (৪:৩৭) "তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে" বলতে দাস-দাসী, বাঁদি, চাকর-চাকরাণী, অধিনস্ত কর্মচারী বুঝায়। (কুরআন মজীদ, টীকা নং- ৬০৫)

এ সম্পর্কে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মামুর (রা.) বলেন, "আমি একবার হযরত আবুযার (রা.) এর সাথে রাবাম নামক স্থানে দেখা করেছিলাম। তিনি এবং তাঁর খাদেম উভয়ই তখন একই রকম চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "আমি একবার নিজ ক্রীতদাসকে গালি দিয়েছিলাম, তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। এতে নবী (সা.) আমাকে বললেন, "আবু যার! তুমি তাকে তার মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দিলে? তুমিতো এমন লোক যার মধ্যে এখনও মূর্খতা রয়ে গিয়েছে। তোমাদের চাকররা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তাদের ভাই থাকলে সে নিজে যা খায় এবং যা পড়ে তাকেও যেন তাই খাওয়ায় এবং পড়ায়। আর তাকে বেশী কষ্টকর কাজ করতে দিও না। এরূপ কাজ করতে দিলে তাকে সাহায্য কর।" (বুখারী- কিতাবুল ইমান) সাম্যের কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত! আরেক হাদীসে বলা হয়েছে যে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই শ্রমিককে তার মজুরী প্রদান কর।" (ইবনে মাজাহ)

১।আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে জীবন।

আত্মীয় স্বজন বলতে পিতৃকূলের, মাতৃকূলের পরিবারদের বুঝায়। এছাড়া নিজ সন্তান ও ভাই বোনদের বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত পরিবারদেরও বুঝায়। এরূপ নিকট ও দূরসম্পর্কের আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে আমাদের বসবাস।

এসব আত্মীয় স্বজনদের সাথে সৌহার্দ বজায় রাখার নির্দেশ ইসলাম দেয়। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তুমি বল, আমি তোমাদের নিকট হতে এর (খিদমতের) বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাইনা। একমাত্র সৌহার্দ ও প্রেম প্রীতি ছাড়া যা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিদ্যমান।" (৪২:৪)। হযরত রসূলে করীম (সা.)ও বলেছেন, "হে মানবজাতি! তোমরা সালাম বলাকে প্রসারতা দাও, গরীবকে খাবার খাওয়াও আত্মীয়তা রক্ষা কর, যখন অন্যান্যরা নিদ্রা যায় তখন নামায পড়। যদি তোমরা এই কাজগুলো কর, তবে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী) আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকলে সেদিক থেকে অশান্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সমাজে এতীমগণ এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আত্মীয় অনাত্মীয় যেকোন পরিবারে এতীম সন্তান থাকতে পারে। এতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, "অতএব যেকোন এতীম হোক, তুমি তার সাথে কঠোরতা করো না।" (৯৩:১০) হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে সেই ঘরটিই উত্তম যেখানে কোন এতীম আছে এবং তার সাথে ভাল আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে সেই ঘরটিই সর্বাপেক্ষা মন্দ যেখানে কোন এতীম আছে অথচ তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।" (ইবনে মাজাহ)

এতীমদের ধন সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও যথাসময়ে তাদেরকে তা প্রত্যাপর্ণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৪:৭)

এতীমদের ধন সম্পদ ভক্ষনকে অগ্নি ভক্ষণ সমতুল্য বলা হয়েছে এবং পরকালে তাদের অবস্থান জাহান্নাম হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (৪:১১) হযরত রসূলে করীম (সা.)ও এতীমদের সম্পদ তাদের বঞ্চিত করে ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

২।সামাজিক জীবন।

সামাজিক জীবনে কীভাবে শান্তি আসতে পারে, কুরআন হাদীস এ সম্পর্কে কী বলে শুনুন:

মানুষ সামাজিক প্রাণী। আদিকাল হতে সে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির দ্বারা সে এই জগতে বসবাস করবে এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। এ কথাই আল্লাহ তাঁর পাক কালামে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "হে মানব মন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।" (৪৯:১৪)

এই জাতি ও গোত্রই সমাজ নামে পরিচিত। "একে অপরকে চিনতে পার" বাক্য দ্বারা এ জগতে মানুষ সহ অবস্থানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে বসবাস করবে এ কথাই বলা হয়েছে। (কুরআন মজীদ টীকা ২৭৯৭) সামাজিক জীবনে প্রত্যেক সদস্যের জন্য একে অপরের প্রতি কিছু দায় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার হতে বাড়িয়ে দিবে, বিপদে-আপদে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে, এভাবে নিজেদের মাঝে মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলবে। সমাজবদ্ধভাবে বাসের উদ্দেশ্য এটাই। এজন্যই সামাজিকভাবে বসবাসকালে যারা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আদান প্রদান করেনা তাদেরকে কুরআন পাকে মোনাফেক বলা হয়েছে। (১০৭:৮) তারা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

সমাজে বসবাস সম্পর্কে হুজুর পাক (সা.) বলেছেন, "একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন, প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতা এবং একের সাহায্যে অপরের ছুটে আসা ঈমানদারকে তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোন অঙ্গে ব্যাথা হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে কাতর হয়ে যায়। ঈমানদার সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ (বুখারী-কিতাবুল আদব)।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মিমাংসা করে ফেল। এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মিমাংসা করতে প্রস্তুত নয় সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সমাজচ্যুত হয়ে যাবে। তোমরা রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কর এবং সামাজিক মনমালিন্য পরিত্যাগ কর। এবং সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় অবনত হও যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হও।" (কিশতিয়ে নূহ)

মানব সমাজও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করতে হবে কুরআন হাদীসে তারও বর্ণনা আছে। এরূপ কয়েক শ্রেণী নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রতিবেশী এদের মধ্যে অন্যতম। তারা আমাদের সবচেয়ে কাছের লোক। তাদের সাথে সহজেই মনোমালিণ্যের কারণ ঘটতে পারে, যার ফলে সমাজে বসবাস কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্য এদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করে চলার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "এবং সদয় ব্যবহার কর আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথেও" (৪:৩৭)।

এ ব্যাপারে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর দীনে সেই ব্যক্তিই উত্তম সহচর যে তার অন্য সহচরদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। এবং উত্তম প্রতিবেশী সে ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।" (তিরমিযী)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) বলেন, "যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয় সে আমার জামাতভূক্ত নয়।" (কিশতিয়ে নূহ)

সমাজের আরেক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠী। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলাও ইসলামের শিক্ষা। সদাচার ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, "এবং যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন তদ্রূপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।" (২৮:৭৮)

উত্তম আচরণ শত্রুকেও আপন করে নেয়। আল্লাহ বলেন, "বস্তুত ভাল ও মন্দ সমান নয়। অতএব তুমি তা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম। সহসা ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে ও তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে। (৪১:৩৫)

কেউ কারও সাথে উগ্র ব্যবহার করলে তাতে উত্তেজিত না হয়ে ধৈর্য্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। কারও নম্র ব্যবহার অন্যের ক্রোধকে প্রশমিত করে দেয়। হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, একজন মোমেন তার উত্তম আচরণ দ্বারা সেই ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে যে সারাদিন রোযা রেখে সারা রাত ইবাদতে কাটায়।" (আবু দাউদ)

বন্ধু বান্ধব সমাজের একটি বড় অংশ। ছাত্রজীবনে বা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বা

নানাপ্রকার পেশাজীবীদের মধ্যে বলতে গেলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব থাকে। ছাত্রাবস্থায় যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা কর্মজীবনেও বা পেশাজীবনেও বলবৎ থাকে। এই বন্ধুত্বের বন্ধন যেমন পরস্পরের প্রয়োজনে আসে, তেমনি সমাজেরও অনেক উপকারে আসে। কেউ কেউ আমৃত্যু এই বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। আবার স্বার্থের দ্বন্দ্বে অনেক বন্ধুও শত্রু হয়ে যায়। এমনকি কেউ কারও মৃত্যুর কারণও হয়ে যায়।

ইসলাম এদিকেও দৃষ্টি দেয়। বন্ধু বান্ধব, সাথী সহচরদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তাঁর পাক কালামে সকলকে সদাচারী হবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। (৪:৩৭) আর হযরত রসূলে করীম (সা.) একই কথা বলেছেন। (উপরে উদ্ধৃত হাদীস)

অনেক সময় অনেকে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসে। এই ঝগড়া সামান্যতেই বড় হয়ে যায়। তাই আল্লাহ এমন অবস্থা হতে দূরে থাকতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, "এবং রহমান আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা তারা যারা ভূপৃষ্ঠের উপর নম্র হয়ে চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে, তখন তারা (কোনো বিবাদ না করে বলে) সালাম।" (২৫:৬৪) এ ব্যবস্থা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কিংবা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য।

সমাজে গরীব, দুস্থ, মিসকীনদের ন্যায় নানাবিধ অসহায় লোকের বসবাস। এরা মাঝে মাঝে সমাজের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সম্পদশালীরও এদিকে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে এদের জন্য আর্থিক খরচের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষের আর্থিক সম্পদের উপর সমাজের অনেকের অধিকার আছে। তিনি এও বলেছেন যে প্রত্যেকের এই অধিকার বা হক আদায় করতে হবে। মানুষের আর্থিক সম্পদে কার কার অধিকার আছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, "এবং সে তারই প্রেমে আত্মীয় স্বজন, এতীম, মিসকীন মুসাফির সাহায্য প্রার্থীগণের এবং বন্দি মুক্তির জন্য ধন সম্পদ খরচ করে।" (২:১৭৮) গরীব মিসকীনদের আল্লাহর প্রেমে খাদ্য প্রদানের কথাও কুরআনপাকে বলা হয়েছে। (৭৬:৯) হাদীসেও অনুরূপ নির্দেশ আছে।

যদি সমাজের সম্পদশালীগণ কুরআনের নির্দেশানুযায়ী তাদের সম্পদ হকদারদের সুষ্ঠুভাবে বন্টন করে তবে এদিক থেকে সমাজে অশান্তির কারণ ঘটার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। ইসলামে মজুদদারী নিষিদ্ধ। সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

সমাজে শান্তি স্থাপনের আর এক পন্থা হল আদল বা ন্যায়বিচার। সমাজে বসবাস করতে হলে অনেক সময় ঝগড়া বিবাদ, ফেৎনা-ফাসাদ, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে জড়িয়ে পড়তে হয়। তখন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন সময় অনেক পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তখন পরিবার-প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করতে বলে। ন্যায় বিচার পেলে বাদী-বিবাদী সবাই বিচারের ফলাফল সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে। আর ন্যায় বিচার না পেলে তারা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই আল্লাহ বলেছেন, "এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করো। আল্লাহ তোমাদের যার উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় তা অতি উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা।" (৪:৫৯)

শত্রু মিত্র ভেদাভেদ না করে ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করলে মানুষের প্রিয় পাত্র হওয়া যায়।

ন্যায়বিচার সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "ন্যায়-নীতিবান বিচারক কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তাঁর ডানপার্শ্বে নূরের (উজ্জ্বল জ্যোতির) মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। অবশ্য আল্লাহর উভয় পার্শ্বই ডান। তারা সেই সব বিচারক বা শাসক যারা নিজেদের বিচার বিধানে পরিবার পরিজনের এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় (মোটকথা সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষেত্রে) ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।" (বুখারী)

বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যতা নিরুপণ করা হয়ে থাকে। ইসলাম এটা সমর্থন করে। সাক্ষ্য প্রদানকালে সত্য সাক্ষ্য প্রদান ইসলামের বিধান। ইসলামে যেমন মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ, তেমন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানও নিষিদ্ধ। মিথ্যা বলাকে কুরআনপাকে 'শির্‌ক' বলা হয়েছে। অনুরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানও। আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকার কারণে মানুষ মিথ্যা বলে তাই এটা শিরক। মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে হযরত রসূলে করীম (সা:) কবিরা বা বড় গুনাহ বলেছেন। (বুখারী) আল্লাহ তালাও সর্বদা সত্য সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এমনকি যদি তা' নিজের পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিপক্ষেও যায়। (৪:১৩৬)

ইসলামে শান্তি কামনার বিধান:

সবধর্মেই পারস্পিরিক দেখা সাক্ষাতে সম্ভাষণের রীতি প্রচলিত আছে। এই সম্ভাষণ একেক ধর্মে বা জাতিতে একেক প্রকার। খ্রীষ্টানগণ বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা-ভাষিগণদের সাথে দেখা হলে good morning এবং বিদায় নেওয়ার সময় good bye বলে থাকে। হিন্দুগণ নমস্কার বা নমস্তে বলে। বিভিন্ন ভাষাভাষীরাও তাদের নিজেদের ভাষায় এসব সম্ভাষণ বিনিময় করে থাকে।

কিন্তু ইসলামের সম্ভাষণ একটু ব্যতিক্রম-ধর্মী। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এজন্য নিজেদের মধ্যে শান্তি কামনা দ্বারা সম্ভাষণ বিনিময় করে। (৬:৫৫) হাদীস শরীফেও এরূপ শান্তি বিনিময়ের উল্লেখ আছে। (তিরমিযী- আবু দাউদ) তারা আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, এমনকি নিজেদের বা অপরের গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি গ্রহণেও সালাম বা শান্তি কামনা দ্বারা। (২৪: ২৮, ৬২) হযরত রসূলে করীম (সা:) মুসলিম পরিবারে ও সমাজে সালামের (ইসলামী সম্ভাষণ) প্রসারতা দানের কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সম্ভাষণে অগ্রগামী।" (আবু দাউদ)

ইসলামের এটা এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে কোন মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে দেখা হলে সে যে দেশ বা যে ভাষাভাষীই হোক না কেন, সম্ভাষণ হয় "আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" অন্যের জওয়াবও একই ভাষায় দেয়া হয়। বলা হয় "ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতাহু।" কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্ভাষণ ভাষা-ভিত্তিক। যেমন বাঙ্গালি হিন্দুগণ দেখা হলে বলে নমস্কার, কিন্তু হিন্দি ভাষার লোকদের সম্ভাষণ হচ্ছে 'নমস্তে'। অর্থ এক হলেও ভাষা ভিন্ন।

অবশ্য অন্য ধর্মের বা ভাষাভাষী লোকের সাথে দেখা হলে সম্ভাষণকালে তাদের নিয়মেই তা করতে হয়।

ধর্মে সহনশীলতা

সব দেশেই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বা একই ধর্মের ভিন্ন মতাদর্শের মানুষ একত্রে বসবাস করে থাকে। অনেক সময় এক ধর্মের প্রতিবেশী অন্য ধর্ম বা মতের হয়ে থাকে। এসব ভিন্ন-ধর্মী বা মতাদর্শীদের যদি সহনশীলতা বা সহমর্মিতা ও সম্ভাব না থাকে তবে দেশে বা সমাজে অশান্তি দেখা দেয়। ধর্মের কারণে অনেক সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়। যার ফলে বহু খুন খারাপি হয়ে থাকে।

এসব দাঙ্গা হাঙ্গামা যেমন বিভিন্ন ধর্ম-গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটে, তেমন একই ধর্মের বিভিন্ন মতাদর্শীদের ভেতরও ঘটে থাকে। যেমন, হিন্দু-মুসলিম, ক্যাথলিক-প্রটেষ্ট্যান্ট, শিয়া-সুন্নি প্রভৃতি।

মুসলমানদের মধ্যে এমন সব উগ্রপন্থি দেখা যায় যারা একে অপরের মসজিদ পর্যন্ত ধ্বংস করে থাকে। অথচ আল্লাহ মসজিদে নামাজিদের বাধাদান ও মসজিদ ধ্বংস করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম আর কে, যে আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং সেগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়। তাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে। (২:১১৫)

শুধু মসজিদ নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উপাসনালয় যেমন, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাও ধ্বংস করা হয়ে থাকে। আল্লাহ এসব উপাসনালয় ধ্বংস নয় বরং সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। (২২:৪১)

ইসলাম সকল ধর্মমতের সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। ইসলাম বলে, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।" (১০৯:৭) অর্থাৎ যার যার ধর্ম তার তার কাছে, যে যার মত স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করবে। এটাই ইসলামী শিক্ষা।

ইসলাম এও বলে, "ধর্মে যবরদস্তি নেই।" (২:২৫৭) অর্থাৎ কাউকে যেমন জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে না, তেমন কাউকে তার ধর্ম ও মত পালনে বাধাও প্রদান করা যাবেনা। তাই ইসলাম অন্য ধর্মের দেব দেবীদের গালি প্রদান করতে নিষেধ করে। কুরআন বলে, "এবং তোমরা তাদের গালি দিওনা যাদের তারা আল্লাহকে ছেড়ে (মাবুদরূপে) ডাকে। নতুবা তারা অজ্ঞতার কারণে শত্রুতা বশত আল্লাহকে গালি দিবে। (৬:১০৯)

(চলবে)

লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর ৪৩তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সময়সূচী ও নির্দেশনা

বাছাই পর্ব: কুরআন তিলাওয়াত, বক্তৃতা ও নযম
(১৯.০৯.২০১৯ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। যারা এই সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে পারবেন না তাদের জন্য বাদ ফজর সুযোগ থাকবে)। সরাসরি হাদীস, ক্বাসীদা ও দরস।

মূল প্রতিযোগিতার সময়সূচী:

কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা: ১ম অধিবেশন (২০.০৯.১৯-শুক্রবার)।

হাদীস ও দরস প্রতিযোগিতা: ২য় অধিবেশন (২০.০৯.১৯-শুক্রবার)।

ক্বাসীদা প্রতিযোগিতা: ২০.০৯.১৯ শুক্রবার হুযুরের খুতবা এবং মাগরিব ও ইশার জমা নামাযের পর।

নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা: ৩য় অধিবেশন (২১.০৯.১৯-শনিবার)।

যেসব বিষয় মানবন্টনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে:
বক্তৃতা: সময়-৫ মিনিট। উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, উদ্ধৃতি [কুরআন, হাদিস, মসীহ মাওউদ (আ.) ও অন্যান্য], সময়ের নির্দিষ্টতা, বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা।

দরস: সময়-৮ মিনিট। পটভূমি/ শানে নযুল, আয়াত অনুযায়ী অর্থ ও তার ব্যাখ্যা এবং উপসংহার (ব্যাখ্যার মূল্যায়ন)।

নযম: উপস্থাপনা, সুর, মুখস্থ, উচ্চারণ।

ক্বাসীদা: মুখস্থ, সুর, উচ্চারণ।

হাদীস: আরবী ও তার অর্থ।

নাসেরাতদের জন্য নির্দেশনা
যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন, তাদেরকে অবশ্যই অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত পরিশোধকৃত চাঁদার রশিদ/সেক্রেটারী মালের প্রদত্ত সনদ আনতে হবে।

পরীক্ষা: ১৯.০৯.২০১৯ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত সকল নাসেরাতের কুরআন তিলাওয়াতের বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ২০.০৯.২০১৯ রোজ শুক্রবার ৮.৩০ ঘটিকায় নাসেরাতদেরকে মসজিদের ৩য় তলায় লিখিত পরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে।

অধিবেশন: ২০.০৯.২০১৯ রোজ শুক্রবার ৩.০০ ঘটিকায় নাসেরাতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

সেক্রেটারী ইশায়াত
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ

তালবীয়া– "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক"

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

মক্কা ও মদীনা মনোয়ারায় হজ্জ পালনরত অবস্থায় হাজীগণের মুখনিঃসৃত পবিত্র তালবীয়া হচ্ছে "লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা"– আমি হাজির। হে আমার আল্লাহ্! আমি হাজির। অন্তরাত্মার গভীর ভালবাসা মিশ্রিত আবেগাপ্লুত কন্ঠের এই তালবীয়া, যা হজ্জের দিনে লাখো হাজী মক্কায় উচ্চরণ করে থাকেন। খোদা ডাকছেন আর হজ্জব্রত বান্দা জগতের তাবৎ মোহ ও অভিলাষ পরিত্যাগ করতঃ বলছেন, লাব্বায়েক, হে আমার আল্লাহ্! তোমার বান্দা হাজির। এই আত্মসমর্পনের মধ্যে তিলার্ধ পরিমাণও কৃত্রিম নেই, নেই বিন্দু পরিমাণ দূরভিসন্ধি, শংসয় ও সন্দেহ। যদি থেকে থাকে, তবে সে হজ্জ স্বার্থক হজ্জ নহে।

হজ্জ পালনকালীন সময়ের পূর্বেকার জীবন কতটুকু মহৎ ও মহান ছিল, সাধুতার মান শতকরা কতটা ছিল, তা বিচারের ভার হজ্জব্রত ব্যক্তির বিবেকের কাছেই রাখলাম। খাকসার ঐ ব্যক্তির মহত্বের মান যাচাই করতে যাচ্ছিনা আর তা আমার কাজও নয়। তবে প্রশ্ন থাকে যে, অবশেষে হজ্জ পালন পূর্বক আমার জীবনের এই অধ্যায়ের যাবতীয় অসততা, অশ্রাব্যতা, অসুন্দর সব কর্ম ক্ষমা করিয়ে নিব, এমন শর্ত সাপেক্ষে যদি হজ্জ পালন করতে আসা হয় আর বলা হয়, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা"- তবে এ হজ্জ করার স্বার্থকতা সম্বন্ধে এন্তার প্রশ্ন থাকে। যদি মনে এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, শেষে সব জানা-অজানা গুনাহ সব মাফ করার ব্যবস্থা হজ্জে তো আছেই। এক্ষণে সেসব পাক-নাপাক নিয়ে ভাববার এত কী প্রয়োজন? তবে সে হাজী সাহেবের হজ্জের সার্থকতা নিশ্চিতই বিতর্কিত। যেমন ধরুন, আমরা বলি, "কামাল ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের মত পবিত্র, নামায পড়ে না এক ওয়াক্ত।" এমন চরিত্রবান কামাল ভাইয়ের হজ্জ পালনের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে হাজার সহস্র। এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকের হজ্জের সার্থকতা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে বন্ধুদেরকে এই মর্মে বলে রাখছি যে, হজ্জ অবশ্যই পুণ্যের কাজ। মহান এক ব্রত। ইসলামের এক মাহার্ঘ্য ও নন্দিত অনুষ্ঠান। এতে মোটেই সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। খোদা কাকে কীভাবে গ্রহণ করবেন তা গাফুরুর রাহিম খোদাই ভাল জানেন। এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। এখানে এসে আমি সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে এক্ষেত্রে খোদার ক'টি কথা প্রণিধান যোগ্য। তিনি (খোদা) বলছেন, "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ। তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেকেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে অগ্রে কী প্রেরণ করিয়াছে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন' (আল কুরআন ৫৯ : ১৯)।

এক্ষণে এ আয়াতের কয়েকটি শব্দ নিয়ে ভাববার অবকাশ থাকে। যেমন খোদা বলছেন, "তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"। অর্থাৎ হজ্জ পালনকারী হউন কিংবা না হোন তা বিষয় নয়, বিষয় হচ্ছে প্রথমেই সবাইকে তাক্ওয়াপরায়ণ হতে হবে। জন্মের পর মানুষকে জ্ঞান প্রাপ্তি হওয়ার সাথে সাথেই অন্তরে খোদাভীতি সঞ্চার করতে হবে। খোদা তাঁর বান্দাকে এমনটি বলেন নি যে, তোমরা আগে হজ্জ পালন কর অতঃপর তাক্ওয়া অবলম্বনকারী হও। বরং বলেছেন জীবনের শুরু থেকেই তোমরা তাক্ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও পরে অন্য কথা। খোদাভীতি ব্যতীত জীবন বৃথা। এরপর শর্তপূরণ সাপেক্ষে হজ্জ পালন কর। শর্ত পূরণ না হলে হজ্জ পালন না করলেও চলবে। পক্ষান্তরে তাকওয়া অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোন শর্তারোপ নেই। ধনী নির্ধন, ছেলে-মেয়ে, যুবা-বৃদ্ধা, সুস্থ-অসুস্থ, প্রজা-শাসক, নফর-বাদশাহ, জ্ঞানী-মুর্খ, অন্ধ-চক্ষুস্মান, সবল-দুর্বল, লেংড়া-খোঁড়া, কালো-সাদা, সবার বেলায়ই তাক্ওয়াপরায়ণ হওয়ার সমান নির্দেশ রয়েছে। এ ব্যাপরে কারো জন্য তিলার্ধ পরিমাণও ছাড় নেই। আগে তাকওয়া অবলম্বন পরে হজ্জ পালন। হজ্জ পালন আগে নয়। তা-ও আবার শর্ত সাপেক্ষে। সুতরাং প্রাথমিক জীবনে যাচ্ছেতাই করে প্রান্ত জীবনে এসে হজ্জ পালন করে নিব। নামায পড়ব। দাড়ি রাখব, সদা সত্য বলব, মাথায় টুপি পড়ে হাতে তছবীহ নিয়ে মুমিন হয়ে খোদার গ্রহণীয় হবো সরাসরি এমনটি ভাবা প্রকৃত মুমিনের কাজ হতে পারে না। তাকওয়া পরায়ণ হওয়ার খোদার এই নির্দেশ তথাকথিত হাজীদের জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়। সুতরাং আসুন হজ্জ পালন করার পূর্বে আমরা তাক্ওয়াপরায়ণ হই। তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত হই। খোদা ও আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) আমাদেরকে যা বলতে, করতে, শুনতে ও মানতে নির্দেশ দিয়েছেন তা আগে পালন করি এবং তাকওয়াশীল হই। অতঃপর আসুন হজ্জ করার ব্রত নেই।

এখানে বান্দার প্রতি খোদা তা'লার দ্বিতীয় নির্দেশ হলো– খোদা বলেছেন, "হে আমার প্রিয়গণ! ভেবে দেখ, তোমরা অগ্রে কী প্রেরণ করেছ। এটা খোদার একটি উদাত্ত আহ্বান। আমরা যেন আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তা করি পূর্বেকার মুহূর্তে আমরা খোদা সমীপে পুণ্যতার কী প্রেরণ করেছি। আমি কী পুণ্যতায় পরিপূর্ণ হতে পেরেছি? আমার ওপর অর্পিত ঐশী দায়িত্ব কী আমি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছি? পরিশুদ্ধ ইবাদত গুজার হতে পেরেছি?

হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল এবাদের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়েছি? খোদার দরবারে আমার অতীত জীবনের প্রেরিত মালামাল কী পরিশুদ্ধ বিমল না পচা-বাসী-গান্ধা রদ্দি মাল? সেসব মাল কী খোদার কাছে নন্দিত না নিন্দিত হয়েছে? উৎকৃষ্ট হিসাবে গৃহীত হয়েছে না উচ্ছিষ্ট হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে? এমনটি অবধারিত সত্য যে, অগ্রে প্রেরীত আমার আধ্যাত্মিক মালামাল যদি পবিত্র না হয়ে থাকে তবে সেসব অবশ্যই খাস দরবার হতে প্রত্যাখ্যাত হবে। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ পালন যথার্থ হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন থাকে।

তদুপরি খোদার তৃতীয় উক্তি হলো, আমরা যে কর্মই করি না কেন খোদা আমাদের সব কাজেরই খবর রাখেন। সুতরাং এখানে লকোচুরির অবকাশ নেই। তাক্‌ওয়া পরায়নতা উৎকৃষ্ট মানের না হলে হজ্জ অবশ্যই মর্যাদামন্ডিত হবে না। আমি যা-ই করছি না কেন খোদা তার সব খবরই রাখছেন। এ কথার ইঙ্গিত হচ্ছে সব কর্মের মূলেই রয়েছে খোদাভীতি, অর্থাৎ আত্মার মুক্তির মূল ভিত্তিই হলো তাক্‌ওয়া।

হে প্রিয়গণ! যারা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জন্মভূমি দর্শনে যাচ্ছেন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে যাচ্ছেন, যমযমের পানি পানের আশায় যাচ্ছেন, আপনারা স্ব স্ব আত্মাকে প্রশ্ন করুন আপনার বিগত জীবন কতটুকু পরিশুদ্ধ? নির্মল না কর্দম। আপনার আমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কর্মও আমাদের খোদার জানা আছে। খোদা তাঁর বিচার বিধানে এমন কোন দরাজ ব্যবস্থা রাখেন নি যে, হজ্জের পূর্বেকার জীবনে অসম্ভব ধরণের অপকর্ম করব। অতঃপর হজ্জ ব্যবস্থা তো আছেই। রাসূলের রওজা মুবারক জিয়ারত করে তার সবকিছুরই ক্ষমা করিয়ে নিব এমনটি ঐশী বিধান হতে পারে না। এমনটি হলে খোদা কখনও বলতেন না যে, বান্দার সব বিষয়ে তিনি সবিশেষ খবর রাখেন। এরূপ যদি থেকেই থাকে তবে খোদা পক্ষপাতদুষ্ট বলে বিবেচিত হতেন, নাউযুবিল্লাহ্‌। কেননা নিঃস্ব ও দুস্থ জনগোষ্ঠি প্রশ্ন করে বসবে, হে আমাদের প্রিয় খোদা! বিত্তবানদের পাপ মোচন করার তুমি একটা উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছ অথচ আমাদের বেলায় কেন তেমনটি রাখনি? বিষয়টি তুমি তোমার মহান অনুকম্পার বিবেকে বিবেচনা কর। কেননা আমরা কক্ষণো জাহান্নামবাসী হতে চাই না।

আমার উক্ত কথাগুলির তাৎপর্য হিসাবে বলছি যে, অধুনা হজ্জ পালনকারীদের মনোভাব অনেকটা অনুরূপ বলেই বিবেচিত হয়। কেননা ফুলের মত পবিত্র চরিত্রবান সমাজসেবী হজ্জ পালনে যাচ্ছেন আর সাথে নিয়ে যাচ্ছেন নামায শিক্ষা বই, নামায পড়ার কায়দা শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ নামায সম্পর্কে তার ধারণা নেই। অথচ তিনি যাচ্ছেন হজ্জে। অনেকে যাচ্ছেন টাকার গরিমা প্রকাশের বাসনায়, অপবিত্র টাকাকে পবিত্র করার মানসে। সামাজিক ব্যুৎপত্তি লাভের আশায়। ব্যবসায় সুনাম প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। সন্তানদের বিয়ে-শাদিতে সুখ্যাত জনের কন্যা/ছেলে প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। নামের পূর্বে "আলহাজ্জ" শব্দটি বসিয়ে নামের শোভা বর্ধনের প্রত্যাশায় অতঃপর সামাজিক কুকর্ম করার পর সেসবের বাইরে থাকার কৌশল হিসেবে। রাজনীতির রাজ্যে শত যুলুমবাজ হওয়া সত্ত্বেও মহর্ষি নেতা হিসাবে স্বীকৃতি অর্জনের প্রত্যাশায়। পবিত্র পিতা হযরত ইব্রাহীম ও পবিত্র ছেলে হযরত ইসমাঈল এবং পবিত্র মাতা হাজেরা যে অসাধারণ কুরবানীর বদৌলতে আমাদেরকে যে হজ্জ উপহার দিয়েছেন আজ এ কুরবানীর কোন কিছুই বিদ্যমান নেই। নেই হজ্জ গমনকারীদের চিত্তে খোদাভীতি, কান্নার অশ্রু, দোয়ায় আত্মনিয়োগ। নেই পরোপকার সাধন আর সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য। হজ্জে যাচ্ছি মানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ত্যাগের মহিমা স্বীয় আত্মায় বিকাশ করা। বাবা মায়ের দ্বারা সাদরে পালিত সন্তানকে যবেহ করে ফেলার অসম্ভব ত্যাগ সন্তাপ আর বেদনা জ্বালা স্বীয় আত্মায় উদ্রেক করা। তা নয়, বরং সে অনুষ্ঠানে হাজী সাহেবকে পালকিতে বসিয়ে, শত হাজার জন সে পালকি বহন করে, হাজী সাহেবের গলায় পুষ্প মাল্য পড়িয়ে ঢোল-ঢাক পিটিয়ে নৃত্য করে পাড়া-মহল্লা ঘুরে ঘুরে হজ্জপালনকারীকে নিয়ে যাচ্ছে বাসে-ট্রেনে করে বিমান বন্দরে। পিছনে থাকছে একজন হজ্জ পালনকারীর জন্য দশটি বাসের মিছিল। আনন্দ উল্লাস হৈ চৈ- রৈ রৈ আরো কত কিছু, আরো অনেক কিছু।

হে হজ্জ! কোথায় তোমার আত্মত্যাগ আর কোথায় তোমার তাক্‌ওয়াপরয়ণতা ও বেদনা বিধুর চিত্র? উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ মান ও সুনাম? মানবাত্মার পবিত্রতা? এর কোন কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। নেই শান্তির পক্ষের কোন কর্ম। এই হাজী সাহেবগণই দেশে ফিরে মুসলমান বলে দাবীদার আহমদীদেরকে বলছে অমুসলমান কাফের। আহমদীদেরকে ঢালাও ভাবে কতল করার ফতওয়া দিচ্ছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে খুন করছে একে অন্যকে। এক ফির্কার নেতা অন্য ফির্কার সদস্যদের বলছে কাফের অমুসলমান। এতে করে কেউ আর মুসলমান বাকী থাকল না। হায়! এই-ই কী হজ্জের বৈশিষ্ট্য?

কাবায় উপস্থিত লক্ষ হাজার হাজীদের লক্ষ্য করে বলছি, যারা নিবেদিত চিত্তে বলছেন, "লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা" আপনারা যুগের মাহদীকে জানুন যিনি খোদার পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবী করছেন। আর তাঁর সে দাবীর সত্যতার পক্ষে চন্দ্র ও সূর্য অসাধারণ ব্যতিক্রম ধর্মী কর্ম সাধন পূর্বক স্বাক্ষ্য দিয়েছে। কুরআনের মহান ভাষ্য যাঁর সত্যতার পক্ষে শতত স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। মহান রসূল (সা.)-এর মহান বাণী যাঁকে ঐশী প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাঁর দিক হতে মুখ না ফিরিয়ে বরং ভাল তাঁকে সাদরে গ্রহণ করুন। আপানাদের গলার পুস্প মালা তাঁর গলে পড়িয়ে দিন অত:পর তাঁর পবিত্র জামাতে আত্মসমর্পন করুন। তদীয় পবিত্র ব্যক্তির জামাতের পবিত্রদেরকে অমুসলমান কাফের বলে নিজেদেরকে কাফের বানানোর সর্বনাশা কাজ করবেন না। (আল হাদীস)। এরূপ কক্ষণো মু'মিনের কাজ নয়। দোয়া করছি খোদার অনুকম্পায় আপনারা প্রকৃতরূপের হাজী হোন।

হে আমাদের প্রিয় খোদা! তুমি আমাদের সবাইকে পবিত্রতা ও তাক্‌ওয়া পরায়ণতার মধ্যে হজ্জ পালন করার তৌফিক দান কর। ক্বাবা তাওয়াফকারী সবার হৃদয়ে পবিত্র আবেগ সৃষ্টি করে দাও যেন তারা হজ্জের পুণ্যতার বিনিময়ে তোমার মহান প্রতিনিধিকে সত্য বলে চিনতে ও জানতে সক্ষম হয়। ঐশী সত্যের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে। তোমার দলের সজ্জন ও সৎকর্মী হয়ে ইসলামের ধ্বজাধারী হতে পারে। হে খোদা! তুমি অঢেল পুণ্যতা দিয়ে পরিপূর্ণ কর রাসূল (সা.)-এর শহরের অপরূপ সুন্দর হজ্জের অনুষ্ঠানকে।

লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা।

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকায় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১৯/০৬/২০১৯ তারিখ বাদ মাগরিব সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতি সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন খালেদা বেগম। হাদীস পাঠ করেন সুবিয়া আহমেদ এবং নযম পরিবেশন করেন নায়লা আহমেদ। এই সভা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর হালকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট ডাঃ মাহমুদা ইসলাম সাহেবা। তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা সভায় উপস্থিত লাজনাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খোরাক যুগিয়েছে। পরে হালকার প্রেসিডেন্ট সাহেবা দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গিয়াসউদ্দিন আহমদ
প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা

চাঁদপুর চা বাগান জামাতের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখ ছোট লাদিয়া হালকার মরহুম মতিউর রহমান সাহেবের বাগিয়ারগাঁও বাড়ীতের সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরু হয় খাকসারের সভাপতিত্বে। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আকাশ আহমদ এবং নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ কুদ্দুছ মিয়া।

বক্তৃতা করেন মৌলভী আসলাম আহমদ মোয়াল্লেম, মাওলানা জুনায়েদ আহমদ, ইনচার্জ সিলেট অঞ্চল। জামাল আহমদ, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চাঁদপুর, চা বাগান। জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামাতের প্রেসিডেন্ট সহ কয়েকজন খাদেম এতে উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার পর জলসা সমাপ্ত করা হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট, চাঁদপুর চা বাগান

ভাদুঘর জামাতের উদ্যোগে মুসিয়ান সম্মেলন ২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৮/০৬/২০১৯ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাদুঘরে জুমুআর নামাযের পর মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব ফাহিম আলম এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচিত নযম পরিবেশন করেন জনাব এহসান এলাহী রুবেল। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ ফিরোজ হোসেন এবং পরিশেষে নেযামে ওসীয়্যতের ওপর বক্তৃতা প্রদান ও দোয়া পরিচালনা করেন মৌলাভী ফালাউদ্দীন সাদেক, মুরুব্বী সিলসিলাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০ মুসী সহ মোট ৩৬ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ ফিরোজ হোসেন
প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাদুঘর

শাহবাজপুর জামাতের উদ্যোগে মুসিয়ান সম্মেলন ২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ২১/০৬/২০১৯ তারিখ বাদ জুমুআ উক্ত জামাতে মুসিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে ৯ জন মুসীর মধ্যে ৬ জন উপস্থিত ছিলেন বাকী ৩ জন মুসী বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে পারে নি। জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব উক্ত সভা পরিচালনা করেন। সভায় ওসীয়্যতের কল্যাণ ও গুরুত্বের ওপর স্থানীয় মোয়াল্লেমসহ অন্যান্যগণ বক্তব্য রাখেন। পরে সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

ফরহাদ আলী মোয়াল্লেম
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শাহবাজপুর

ফতুল্লা জামাতের উদ্যোগে মুসিয়ান সম্মেলন ২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৮/০৬/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মোহতরম আব্দুর রহমান, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার সভাপতিত্বে মুসী ও মুসীয়াদেরকে নিয়ে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুসী জনাব নাজমুল ইসলাম সরকার। অতঃপর ওসীয়্যতের নিয়মাবলী ও বিধিবিধান সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব সামসুদ্দিন আহমদ সাহেব এবং মাওলানা খালেদ মুসনাদ খান, মুরুব্বী সিলসিলা। তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ওসীয়্যত-এর গুরুত্ব ও কল্যাণ। সবশেষে সভাপতি সাহেব ওসীয়্যত করার আবেদন ও ওসীয়্যতকারীদের তাক্ওয়ার মান উন্নয়নের ওপর বক্তব্য রেখে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ১২ জন ওসীয়্যতকারী সহ মোট ৫৮ জন সদস্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রশ্ন-উত্তর-এর ব্যবস্থা ছিল।

আব্দুর রহমান, প্রেসিডেন্ট

আল্ ওসীয়্যত পুস্তকের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৮/০৬/২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কোড্ডার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট কোড্ডা-এর সভাপতিত্বে আল ওসীয়্যত পুস্তকের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এজাজ আহমদ ভূইয়া। শুরুতে আল ওসীয়্যত পুস্তক পাঠ করে ওসীয়্যতের তাৎপর্য পর্যায়ক্রমে ব্যাখ্যা করেন জনাব শরীফ আহমদ ভূইয়া, জনাব মোস্তাক আহমদ ভূইয়া, জনাব এনামুল হক ইন্টু এবং জনাব আব্দুল হাকীম মোয়াল্লেম, কোড্ডা। সবশেষে সভাপতি সাহেবের মূল্যবান আলোচনা ও দোয়ার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ৩৪ জন মুসী মুসীয়া উপস্থিত ছিল। সমাপ্তির পর সবার জন্য প্যাকেট-খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

এনামুল হক ইন্টু
সেক্রেটারী ওসীয়্যত

চাঁদপুর চা বাগান জমাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চাঁদপুর চা বাগানের উদ্যোগে গত ১৪/ ০৫/২০১৯ বাদ আসর চন্ডিছড়া LVC-এর বাসায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট চাঁদপুর চা বাগান জামাত। প্রথমে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান পাপন এবং নযম পরিবেশন করেন কামরুল হাসান ইমন। বক্তৃতা প্রদান করেন মাহমুদুল হাসান ও আসলাম আহমদ মোয়াল্লেম সাহেব। খাকছার ব্যক্তিগতভাবে ইফতারের আয়োজন করে। এতে চা বাগানের বর্তমান ও সাবেক পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি সহ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট

চাঁদপুর চা বাগান জামাতে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৮/০৫/২০১৯ আহমদীয়া মুসলিম জামাত চাঁদপুর চা বাগানের উদ্যোগে বাদ আসর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাসেম আহমদ চৌধুরী আরাফ এবং নযম পরিবেশন করেন মাহমুদুল হাসান পাপন।

এরপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী ও জনাব মাহমুদ আহমদ চৌধুরী। সভাপতির বক্তৃতার পর বায়তুস সামী মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট

বটিয়াপাড়া জামাতের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন

গত ২৮/০৬/২০১৯ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ সম্মিলিতভাবে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মিরাজুল ইসলাম। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান এবং নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন।

এরপর বক্তৃতা করেন জুলফিকার আলী হায়দার। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ‘খেলাফতের গুরুত্ব’। ঔল্টুর রহমান, তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ‘খেলাফতের কল্যাণ’। মোহাম্মদ আমিনুজ্জামান, তার বিষয়বস্তু ছিল ‘খেলাফতের বিশ্ববিজয়’। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা মজলিসের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালিত

গত ২৯/০৬/২০১৯ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে মহান খেলাফত দিবস পালন করা হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট সাহেবা। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর লাজনা এবং নাসেরাতগণ খেলাফত বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পাঠ, নযম এবং বক্তব্য পেশ করেন। সভাপতি সাহেবার বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৮ জন লাজনা ১৫ জন নাসেরাতসহ মোট উপস্থিত ছিলেন ৮৮ জন।

রুবি দুলাল
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনের বার্ষিক রিজিওনাল কর্মশালা ২০১৯ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ মেহেরবানীতে গত ৩০ মার্চ ২০১৯ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনের বার্ষিক রিজিওনাল কর্মশালা-২০১৯ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী-যয়ীমে আলা, তারুয়া। সভাপতি কর্তৃক আহাদনামা পাঠ, উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার পর স্থানীয় মজলিসের যয়ীমে আলা/যয়ীমগণের সাথে মোহতরম সদর সাহেব পরিচিত হন। অতঃপর যয়ীম/যয়ীম আলাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ-কায়েদ মাল সাহেব। অতঃপর জেলা মজলিসের রিপোর্ট প্রদান করেন বৃহত্তর সিলেট জেলার জেলা নাযেম আলা জনাব জানে আলম এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার জেলা নাযেম আলা জনাব মুহাম্মদ আল-আমিন। উক্ত বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর নামায এবং দুপুরের খাবারের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। বেলা ২.৩০ মিনিটে পুনরায় কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্বে কর্মশালায় আগত ২৩টি মজলিসের যয়ীম আলা/যয়ীমগণের প্রদত্ত মজলিসের কার্যক্রমের ওপর মোহতরম সদর সাহেব প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রাণবন্ত ও খোলামেলা আলোচনা হওয়ায় এ পর্বটি বেশ উপভোগ্য ছিল। অতঃপর মোহতরম সদর সাহেবের আহ্বানে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আলহাজ্জ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল-কায়েদ এশায়াত। রিজিওনাল মজলিসের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোশারফ হোসেন– রিজিওনাল নাযেম আলা। সবশেষে মোহতরম সদর সাহেবের দিক-নির্দেশনামূলক সমাপ্তি ভাষণ প্রদানের পর দোয়ার মাধ্যমে বার্ষিক কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বার্ষিক রিজিওনাল কর্মশালায় ২৩টি মজলিস থেকে যয়ীমে আলা/ যয়ীম এবং প্রতিনিধিগণসহ সর্ব মোট ৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোশারফ হোসেন
রিজিওনাল নাযেম আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ্
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওন

শোক সংবাদ

আমার আম্মা মোছাঃ হালিমা বেগম গত ০৬/০৭/২০১৯ তারিখে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। আমরা তাঁর রেখে যাওয়া বংশধরগণ জামাতের সর্ব স্তরের সদস্যবৃন্দের সমীপে খাস দোয়ার আরজ করছি, দয়াময় খোদা যেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া মায়ের বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করেন এবং তাঁর রেখে যাওয়া পরিবারের শোকার্ত সদস্যদেরকে পূর্ণ ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দান করেন। আমাদের সবাইকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বপ্রকার কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত করেন।

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাজিরপুর

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন, প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

নও-মোবাঈন
১ম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৯ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে আয়োজিত নও-মোবাঈনদের ১ম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তাহরীকে জাদীদ এর বিধি মোতাবেক নও-মোবাঈনদের (নতুন বয়াত গ্রহণকারী) জন্য প্রতি বছর অন্তত: একটি পৃথক ইজতেমা আয়োজন করার বিধান রয়েছে। সেই মোতাবেক মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে নও-মোবাঈনদের জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা গত ২৮ ও ২৯ জুন, ২০১৯ রোজ শুক্র ও শনিবার বকশীবাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইজতেমায় যোগদানকারী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছিল। সারাদেশে অবস্থানরত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বয়াত গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলা নও-মোবাঈন সদস্য ও সদস্যাদের জন্য এই ইজতেমার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার বাদ জুমুআ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন নও-মোবাঈন সদস্য হাফেয শাফী আনা সাহেব। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সাহেব।

ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী নও-মোবাঈন সদস্য ও সদস্যাগণ তাদের পরিচয় পেশ করেন এবং তারা কিভাবে আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছেন– তা বর্ণনা করেন। তারা বয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন এবং আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার পর আধ্যাত্মিকভাবে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তার বর্ণনা করেন। এর মধ্যে কয়েকজন পারিবারিক ও সামাজিকভাবে চরম মোখালেফাতের মধ্যেও কিভাবে তবলীগী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তার বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে মূল তরবিয়তী বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জও বর্তমান ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে উপস্থিত সকলকে নসিহত করেন এবং সামাজিক ব্যাধি ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিজ গৃহে অনুশীলনের আহ্বান জানান। তিনি নিয়মিতভাবে দোয়া করা এবং যুগ খলীফার (আই.) সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দান করেন। তিনি বিশেষভাবে নও-মোবাঈনদের নিয়মিত জুম্মার নামাযে হাজির হতে এবং সামান্য পরিমাণে হলেও তাদেরকে নিয়মিত চাঁদা (আর্থিক কুরবানী) প্রদান করতে অনুপ্রাণিত করেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী নও-মোবাঈনগণ এম টি-এ-তে সরাসরি প্রচারিত হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা ও "সত্যের সন্ধানে" অনুষ্ঠান দেখেন।

শনিবার সকাল থেকে নও-মোবাঈনদের জন্য তালীম-তরবিয়ত ও তবলীগী মসলা-মাসায়েল ও প্রশিক্ষণমূলক বিষয়-ভিত্তিক ক্লাসের আয়োজন করা হয়। এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মাওলানা সোলায়মান সুমন, মাওলানা শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা নাসের আহমদ আনসারী সাহেব। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নোত্তোরের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইজতেমায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ২টি তরবীয়তী ও ২টি খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

শুক্রবার বাদ জুমুআ থেকে পরদিন শনিবার বিকাল পর্যন্ত চলমান এই ইজতেমায় ৩৩৬ জন পুরুষ ও ৭৯ জন মহিলা (মোট ৪১৫ জন নও-মোবাঈন) অংশগ্রহণ করেন। মোট ৪৭টি স্থানীয় জামাত হতে নও-মোবাঈনগণ ইজতেমায় যোগদান করেন। ইজতেমা চলাকালীন সময়ে ৫ জন বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হয় এবং কেন তারা আহমদী হলেন তার বর্ণনা দেন। সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্বের উর রহমান সাহেব। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে নও-মোবাঈনদের জন্য আয়োজিত জাতীয় ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

আবু জাকির আহমদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্‌ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্‌ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 1st Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th July, 2019 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

MTA Muslim TV Ahmadiyya International
mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)